# ৪

# প্রবন্ধ

প্রবন্ধের পঠন-বৈশিষ্ট্য এবং উদ্ভব ও বিকাশের ধারা সম্পর্কে আপনারা ইউনিট-১ অংশে অবহিত হয়েছেন। এ ইউনিটে বাংলা প্রবন্ধের উলিখিত ধারার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পাঁচটি প্রবন্ধ নির্বাচিত করা হয়েছে। এ প্রবন্ধগুলো পাঠশেষে আপনি প্রবন্ধ সম্পর্কে আপনার অর্জিত ধারণাকে মিলিয়ে নিতে পারবেন। নিম্নোক্ত বিন্যাস-ক্রমে প্রবন্ধসমূহ উপস্থাপিত হল:

- *পাঠ-১.১/১.২ : বাঙ্গালা ভাষা*
- *পাঠ-২.১/২.২ : সভ্যতার সংকট*
- *পাঠ-৩.১/৩.২ : যৌবনে দাও রাজটিকা*
- *পাঠ-৪.১/৪.২ : সংস্কৃতি কথা*
- *পাঠ-৫.১/৫.২ : বাংলা গদ্যরীতি*

**পাঠ-১.১**

# বাঙ্গালা ভাষা

## বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

**(১৮৩৮-১৮৯৪)**

## উদ্দেশ্য

## এ পাঠ শেষে আপনি—

- সাধুভাষা ও বঙ্কিমচন্দ্র কথিত 'অপর ভাষা'র সংজ্ঞার্থ ও সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারবেন।
- রামগতি ন্যায়রত্নের মতে বাংলা গদ্যের স্বরূপ বিশেষণ করতে পারবেন।

## ভূমিকা

বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক উপন্যাস রচনা করে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে আছেন। উপন্যাস রচনার পাশাপাশি সাহিত্যের অন্যান্য শাখাতেও তাঁর মননশীলতার পরিচয় সুস্পষ্ট। বিশেষত প্রবন্ধ রচনা করে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সমকালে যে চিন্তা-চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছিলেন, বিষয়বস্তু বিচারে তা উলেখের দাবি রাখে। উনিশ শতকের বাংলা গদ্য গড়ে ওঠার সময় তাঁর প্রবন্ধ-রচনাশৈলীও এক বিশেষ গদ্যভঙ্গির প্রতিনিধি হিসেবে সমাদৃত হয়।

## লেখক পরিচিতি

'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধের লেখক বঙ্গিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বর্তমান ভারতের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার নৈহাটি থানার কাঁঠালপাড়া গ্রামে ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁর জন্ম। পিতার নাম যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দের ২৩ অক্টোবর হুগলী কলেজের বিদ্যালয় বিভাগে প্রথম ভর্তি হন। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজে আইন বিষয়ে লেখাপড়া শুরু করেন। ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত প্রথম এন্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। পরের বছর গ্র্যাজুয়েট হন দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। ওই বছরই যশোরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর নিযুক্ত হন।

১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'ললিতা তথা মানস' নামক কাব্য প্রকাশিত হয়। 'দুর্গেশনন্দিনী' তাঁর রচিত প্রথম বাংলা উপন্যাস; বের হয় ১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দে। 'সীতারাম' (১৮৮৮) তাঁর সর্বশেষ উপন্যাস। ১৮৭২ থেকে ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি 'বঙ্গদর্শন' নামক একটি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা করেন।

সার্থক উপন্যাস রচনাই শুধু নয়, বাংলা ভাষায় প্রথম তুলনামূলক সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধও তিনি রচনা করেন। তাঁর হাতে বাংলা গদ্যরীতি বিশিষ্টতা অর্জন করে। বিদ্যাসাগরের সংস্কৃতানুসারী ভাষা ও প্যারীচাঁদ মিত্রের কথ্য বাক্-ভঙ্গি নতুনভাবে বিন্যস্ত করে তিনি একটি নিজস্ব গদ্যরীতি প্রবর্তন করেন। 'বঙ্গদর্শনে'র মতো একটি উচ্চাঙ্গের সাময়িক পত্রিকা সম্পাদনা করেও তিনি বাংলা গদ্যের শ্রীবৃদ্ধিতে বিশেষ অবদান রাখেন। নিজেও প্রবন্ধের বিষয় ও আঙ্গিকে বৈচিত্র্য আনয়ন করেন। লঘু কৌতুক, হাস্যরস, তীক্ষ ব্যঙ্গ, মননশীলতা, গাম্ভীর্য, আবেগ ইত্যাদির সংমিশ্রণে তাঁর প্রবন্ধ বিশিষ্ট হয়ে ওঠে।

## পাঠ-পরিচিতি

'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধটি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বিবিধ প্রবন্ধ' নামক প্রবন্ধ-গ্রন্থের দ্বিতীয় খন্ডের অন্তর্ভুক্ত। এই প্রবন্ধ ১২৮৫ বঙ্গাব্দের 'বঙ্গদর্শন' সাময়িক পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়। এটি লেখকের একটি চিন্তামূলক প্রবন্ধ। চিন্তাটি মূলত বাংলা ভাষা ও তার লেখ্যরীতি সম্পর্কিত। এই প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা গদ্যরীতির উৎকর্ষ বিষয়ক নিজস্ব সুচিন্তিত মতামত প্রদান করেছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর সমকালীন উল্লেখযোগ্য গদ্য রচয়িতাদের ভাষারীতি বিশেষণ করা হয়েছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং প্যারীচাঁদ-কালীপ্রসন্নর ভাষারীতিই ওই সময় বাংলা গদ্যচর্চায় ব্যবহৃত হত। বঙ্কিমচন্দ্র এঁদের চর্চিত ভাষারীতিকে শাণিত বুদ্ধি ও আধুনিক চিন্তার আলোকে বিশেষণ করেছেন। একই সঙ্গে যৌক্তিক

যুক্তির পারম্পর্যে এই উভয় মতের সমন্বয়ের মাধ্যমে বাংলা গদ্যরীতি সম্পর্কে নিজস্ব বক্তব্য প্রদান করেন বলে প্রবন্ধটির নামকরণ করা হয় 'বাঙ্গালা ভাষা'। নামকরণটি নিঃসন্দেহে যথাযথ হয়েছে।

# মূলপাঠ

প্রায় সকল দেশেই লিখিত ভাষা এবং কথিত ভাষায় অনেক প্রভেদ। যে সকল বাঙ্গালী ইংরেজি সাহিত্যে পারদর্শী, তাঁহারা একজন লন্ডনী কক্‌নী বা একজন কৃষকের কথা সহজে বুঝিতে পারেন না, এবং এতদ্দেশে অনেকদিন বাস করিয়া বাঙ্গালীর সহিত কথাবার্তা কহিতে কহিতে যে ইংরেজেরা বাঙ্গালা শিখিয়াছেন, তাহারা প্রায় একখানিও বাঙ্গালাগ্রন্থ বুঝিতে পারেন না। প্রাচীন ভারতেও সংস্কৃত ও প্রাকৃতে, আদৌ বোধ হয়, এইরূপ প্রভেদ ছিল, এবং সেই প্রভেদ হইতে আধুনিক ভারতবর্ষীয় ভাষাসকলের উৎপত্তি।

বাঙ্গালার লিখিত এবং কথিত ভাষায় যতটা প্রভেদ দেখা যায়, অন্যত্র তত নহে। বলিতে গেলে, কিছুকাল পূর্বে দুইটি পৃথক্ ভাষা বাঙ্গালায় প্রচলিত ছিল। একটির নাম সাধুভাষা; অপরটির নাম অপর ভাষা। একটি লিখিবার ভাষা, দ্বিতীয়টি কহিবার ভাষা। পুস্তকে প্রথম ভাষাটি ভিন্ন, দ্বিতীয়টির কোন চিহ্ন পাওয়া যাইত না। সাধুভাষায় অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দসকল বাঙ্গালা ক্রিয়াপদের আদিম রূপের সঙ্গে সংযুক্ত হইত। যে শব্দ আভাঙ্গা সংস্কৃত নহে, সাধুভাষায় প্রবেশ করিবার তাহার কোন অধিকার ছিল না। লোকে বুঝুক বা না বুঝুক, আভাঙ্গা সংস্কৃত চাহি। অপর ভাষা সে দিকে না গিয়া, যাহা সকলের বোধগম্য, তাহাই ব্যবহার করে।

গদ্য গ্রন্থাদিতে সাধুভাষা ভিন্ন আর কিছু ব্যবহার হইত না। তখন পুস্তকপ্রণয়ন সংস্কৃত ব্যবসায়ীদিগের হাতে ছিল। অন্যের বোধ ছিল যে, যে সংস্কৃত না জানে, বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রণয়নে তাহার কোন অধিকার নাই, সে বাঙ্গালা লিখিতে পারেই না। যাঁহারা ইংরেজিতে পন্ডিত, তাহারা বাঙ্গালা লিখিতে পড়িতে না জানা গৌরবের মধ্যে গণ্য করিতেন। সুতরাং বাঙ্গালায় রচনা ফোঁটা-কাটা অনুস্বারবাদীদিগের একচেটিয়া মহল ছিল। সংস্কৃতেই তাহাদিগের গৌরব। তাঁহারা ভাবিতেন, সংস্কৃতেই তবে বুঝি বাঙ্গালা ভাষার গৌরব; যেমন গ্রাম্য বাঙ্গালী স্ত্রীলোক মনে করে যে, শোভা বাড়ুক আর না বাড়ুক, ওজনে ভারি সোনা অঙ্গে পরিলেই অলঙ্কার পরার গৌরব হইল, এই গ্রন্থকর্তারা তেমনি জানিতেন, ভাষা সুন্দর হউক বা না হউক, দুর্বোধ্য সংস্কৃতবাহুল্য থাকিলেই রচনার গৌরব হইল।

এইরূপ সংস্কৃতপ্রিয়তা এবং সংস্কৃতানুকারিতা হেতু বাঙ্গালা সাহিত্য অত্যন্ত নীরস, শ্রীহীন, দুর্বল, এবং বাঙ্গালা সমাজে অপরিচিত হইয়া রহিল। টেকচাঁদ ঠাকুর প্রথমে এই বিষবৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত করিলেন। তিনি ইংরেজিতে সুশিক্ষিত। ইংরেজিতে প্রচলিত ভাষার মহিমা দেখিয়াছিলেন এবং বুঝিয়াছিলেন। তিনি ভাবিলেন, বাঙ্গালার প্রচলিত ভাষাতেই বা কেন গদ্যগ্রন্থ রচিত হইবে না? যে ভাষায় সকলে কথোপকথন করে, তিনি সেই ভাষায় "আলালের ঘরের দুলাল" প্রণয়ন করিলন। সেই দিন হইতে বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি। সেই দিন হইতে শুষ্ক তরুর মূলে জীবন-বারি নিষিক্ত হইল।

সেই দিন হইতে সাধুভাষা, এবং অপর ভাষা, দুই প্রকার ভাষাতেই বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রণয়ন হইতে লাগিল, ইহা দেখিয়া সংস্কৃতব্যসবায়ীরা জ্বালাতন হইয়া উঠিলেন; অপর ভাষা, তাঁহাদিগের বড় ঘৃণ্য। মদ্য, মুরগী এবং টেকচাঁদি বাঙ্গালা এককালে প্রচলিত হইয়া ভট্টাচার্যগোষ্ঠীকে আকুল করিয়া তুলিল। এক্ষণে বাঙ্গালা ভাষার সমালোচকেরা দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছেন। একদল খাঁটি সংস্কৃতবাদী — যে গ্রন্থে সংস্কৃতমূলক শব্দ ভিন্ন অন্য শব্দ ব্যবহার হয়, তাহা তাঁহাদের বিবেচনায় ঘৃণার যোগ্য। অপর সম্প্রদায় বলেন, তোমাদের ও কচকচি বাঙ্গালা নহে। ইহা আমরা কোন গ্রন্থে ব্যবহার করিতে দিব না। যে ভাষা বাঙ্গালা সমাজে প্রচলিত, যাহাতে বাঙ্গালার নিত্য কার্য সকল সম্পাদিত হয়, যাহা সকল বাঙ্গালীতে বুঝে, তাহাই বাঙ্গালা ভাষা — তাহাই গ্রন্থাদির ব্যবহারের যোগ্য। অধিকাংশ সুশিক্ষিত ব্যক্তি এক্ষণে এই সম্প্রদায়ভুক্ত। আমরা উভয় সম্প্রদায়ের এক এক মুখপাত্রের উক্তি এই প্রবন্ধে সমালোচিত করিয়া স্থূল বিষয়ের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিব।

সংস্কৃতবাদী সম্প্রদায়ের মুখপাত্রস্বরূপ আমরা রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়কে গ্রহণ করিতেছি। বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় পন্ডিত থাকিতে আমরা ন্যায়রত্ন মহাশয়কে এই সম্প্রদায়ের মুখপাত্রস্বরূপ গ্রহণ করিলাম, ইহাতে সংস্কৃতবাদীগিদের প্রতি কিছু অবিচার হয়, ইহা আমরা স্বীকার করি। ন্যায়রত্ন মহাশয় সংস্কৃতে সুশিক্ষিত, কিন্তু ইংরেজি জানেন না — পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য তাঁহার নিকট পরিচিত নহে। তাঁহার প্রণীত বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাবে ইংরেজি বিদ্যার একটু পরিচয় দিতে গিয়া ন্যায়রত্ন মহাশয় কিছু লোক হাসাইয়াছেন। আমরা সেই গ্রন্থ হইতে সিদ্ধ করিতেছি যে, পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের অনুশীলনে যে সুফল জন্মে, ন্যায়রত্ন মহাশয় তাহাতে বঞ্চিত। যিনি এই সুফলে বঞ্চিত, বিচার্য বিষয়ে তাঁহার মত তাঁহার নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যেই যে অধিক গৌরব প্রাপ্ত হইবে, এমত বোধ হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত: যে

সকল সংস্কৃতবাদী পন্ডিতদিগের মত অধিকতর আদরণীয়, তাঁহারা কেহই সেই মত স্বপ্রণীত কোন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই। সুতরাং তাঁহাদের কাহারও নাম উলেখ করিতে আমরা সক্ষম হইলাম না। ন্যায়রত্ন মহাশয় স্বপ্রণীত উক্ত সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাবে আপনার মতগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন এই জন্যই তাঁহাকে এ সম্প্রদায়ের মুখপাত্রস্বরূপ ধরিতে হইল। তিনি "আলালের ঘরের দুলাল" হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন যে, "এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, সর্ববিধ গ্রন্থ রচনায় এইরূপ ভাষা আদর্শস্বরূপ হইতে পারে কিনা? — আমাদের বিবেচনায় কখনই না। আলালের ঘরের দুলাল বল, হুতোমপেঁচা বল, মৃণালিনী বল — পত্নী বা পাঁচজন বয়স্যের সহিত পাঠ করিয়া আমোদ করিতে পারি — কিন্তু পিতাপুত্রে একত্র বসিয়া অসঙ্কুচিতমুখে কখনই ও সকল পড়িতে পারি না। বর্ণনীয় বিষয়ের লজ্জাজনকতা উহা পড়িতে না পারিবার কারণ নহে, ঐ ভাষারই কেমন একরূপ ভঙ্গী আছে, যাহা গুরুজনসমক্ষে উচ্চারণ করিতে লজ্জাবোধ হয়। পাঠকগণ! যদি আপনাদের উপর বিদ্যালয়ের পুস্তক নির্বাচনের ভার হয়, আপনারা আলালী ভাষায় লিখিত কোন পুস্তককে পাঠ্যরূপে নির্দেশ করিতে পারিবেন কি? — বোধ হয়, পারিবেন না। কেন পারিবেন না? — ইহার উত্তরে অবশ্য এই কথা বলিবেন যে ওরূপ ভাষা বিশেষ শিক্ষাপ্রদ নয়, এবং উহা সর্বসমক্ষে পাঠ করিতে লজ্জাবোধ হয়। অতএব বলিতে হইবে যে, আলালী ভাষা সম্প্রদায়বিশেষের বিশেষ মনোরঞ্জিকা হইলেও, উহা সর্ববিধ পাঠকের পক্ষে উপযুক্ত নহে। যদি তাহা না হইল, তবে আবার জিজ্ঞাস্য হইতেছে যে, ঐরূপ ভাষায় গ্রন্থরচনা করা উচিত কিনা? আমাদের বোধে অবশ্য উচিত। যেমন ফলারে বসিয়া অনবরত মিঠাই এন্ডা খাইলে জিহ্বা একরূপ বিকৃত হইয়া যায় — মধ্যে মধ্যে আদার কুচি ও কুমড়ার খাট্টা মুখে না দিলে সে বিকৃতির নিবারণ হয় না, সেইরূপ কেবল বিদ্যাসাগরী রচনা শ্রবণে কর্ণের যে একরূপ ভাব জন্মে, তাহার পরিবর্তন করণার্থ মধ্যে মধ্যে অপরবিধ রচনা শ্রবণ করা পাঠকদিগের আবশ্যক।"

আমরা ইহাতে বুঝিতেছি যে, প্রচলিত ভাষা ব্যবহারের পক্ষে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের প্রধান আপত্তি যে, পিতাপুত্রে একত্রে বসিয়া এরূপ ভাষা ব্যবহার করিতে পারে না। বুঝিলাম যে, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বিবেচনায় পিতাপুত্রে বড় বড় সংস্কৃত শব্দে কথোপকথন করা কর্তব্য; প্রচলিত ভাষায় কথাবার্তা হইতে পারে না। এই আইন চলিলে বোধ হয়, ইহার পর শুনিব যে, শিশু মাতার কাছে খাবার চাহিবার সময় বলিবে, "হে মাতঃ, খাদ্যং দেহি মে" এবং ছেলে বাপের কাছে জুতার আবদার করিবার সময় বলিবে, "ছিন্নেয়ং পাদুকা মদীয়া"। ন্যায়রত্ন মহাশয় সকলের সম্মুখে সরল ভাষা ব্যবহার করিতে লজ্জাবোধ করেন, এবং সেই ভাষাকে শিক্ষাপ্রদ বিবেচনা করেন না, ইহা শুনিয়া তাঁহার ছাত্রদিগের জন্য আমরা বড় দুঃখিত হইলাম। বোধ হয়, তিনি স্বীয় ছাত্রগণকে উপদেশ দিবার সময়ে লজ্জাবশতঃ দেড়গজী সমাসপরম্পরা বিন্যাসে তাহাদিগের মাথা ঘুরাইয়া দেন। তাহারা যে এবংবিধ শিক্ষায় অধিক বিদ্যা উপার্জন করে, এমত বোধ হয় না। কেননা, আমাদের স্থূল বুদ্ধিতে ইহাই উপলব্ধি হয় যে, যাহা বুঝিতে না পারা যায়, তাহা হইতে কিছু শিক্ষালাভ হয় না। আমাদের এইরূপ বোধ আছে যে, সরল ভাষাই শিক্ষাপ্রদ। ন্যায়রত্ন মহাশয় কেন সরল ভাষাকে শিক্ষাপ্রদ নহে বিবেচনা করিয়াছেন, তাহা আমরা অনেক ভাবিয়া স্থির করিতে পরিলাম না। বোধ হয়, বাল্যসংস্কার ভিন্ন আর কিছুই সরল ভাষার প্রতি তাঁহার বীতরাগের কারণ নহে। আমরা আরও বিস্মিত হইয়া দেখিলাম যে, তিনি স্বয়ং যে ভাষায় বাঙ্গালা সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব লিখিয়াছেন, তাহাও সরল প্রচলিত ভাষা। টেকচাঁদি ভাষার সঙ্গে এবং তাঁহার ভাষার সঙ্গে কোন প্রভেদ নাই, প্রভেদ কেবল এই যে, টেকচাঁদে রঙ্গরস আছে, ন্যায়রত্নে কোন রঙ্গরস নাই। তিনি যে বলিয়াছেন যে, পিতাপুত্রে একত্র বসিয়া অসঙ্কুচিত মুখে টেকচাঁদি ভাষা পড়িতে পারা যায় না, তাহার প্রকৃত কারণ টেকচাঁদে রঙ্গরস আছে। বাঙ্গালাদেশে, পিতাপুত্রে একত্র বসিয়া রঙ্গরস পড়িতে পারে না। সরল চিত্ত অধ্যাপক অতটুকু বুঝিতে না পারিয়াই বিদ্যাসাগরীয় ভাষার মহিমা কীর্তনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ভাষা হইতে রঙ্গরস উঠাইয়া দেওয়া যদি ভট্টাচার্য মহাশয়দিগের মত হয়, তবে তাঁহারা সেই বিষয়ে যত্নবান হউন। কিন্তু তাহা বলিয়া অপ্রচলিত ভাষাকে সাহিত্যের ভাষা করিতে চেষ্টা করিবেন না।

◆ ◆

## শব্দার্থ ও টীকা

**লন্ডনী ককনী** — লন্ডনের গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা অর্থাৎ লন্ডনের আঞ্চলিক ভাষা।

**প্রাচীন ভারতেও সংস্কৃত ও প্রাকৃতে প্রভেদ ছিল**— আদিকালে ভারতে সংস্কৃত ভাষাভাষী অঞ্চলে অশিক্ষিত জনসাধারণ প্রাকৃতভাষায় ভাব বিনিময় করতো। প্রাচীন ভারতে মানুষের শ্রেণীভাগের মতো ভাষাতেও এমন উচ্চ-নিচ প্রভেদ ছিলো। যেমন, কালিদাসের 'শকুন্তলা' নাটকে দুষ্মন্ত বা শকুন্তলার ভাষা সংস্কৃত হলেও মৎস্যশিকারীর ভাষা প্রাকৃত।

**সংস্কৃত ব্যবসায়ী** — সংস্কৃত পন্ডিত; ব্যঙ্গার্থে প্রয়োগ করা হয়েছে।

**অনুস্বারবাদীদিগের**— সংস্কৃত পন্ডিতদের; বিদ্রূপার্থে। সংস্কৃত ভাষার মতো প্রচুর অনুস্বার ও বিসর্গ ব্যবহার করে যে-পন্ডিতগণ বাংলা ভাষাকে আড়ষ্ট করতে চান তাদের বুঝানো হয়েছে।

**সংস্কৃতানুকারিতা** — সংস্কৃত ভাষাকে অনুকরণ করার প্রবণতা।

**টেকচাঁদ ঠাকুর** — প্যারীচাঁদ মিত্রের ছদ্মনাম টেকচাঁদ ঠাকুর। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন ও ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। বাংলা গদ্যে কথ্য ভাষারীতির তিনি প্রবর্তক। তাঁর মতে, সংস্কৃত শব্দবহুল গদ্যরীতির পরিবর্তে প্রচলিত শব্দনির্ভর সরল গদ্যই বাংলা ভাষায় আদর্শ হওয়া উচিত। এই গদ্যরীতিতে তিনি 'আলালের ঘরের দুলাল', (১৮৫৭) গ্রন্থটি রচনা করেন।

**বিষবৃক্ষ** — যে গাছ বিষাক্ত ফল দেয়। এখানে সংস্কৃতবহুল বাংলাভাষাকে বলা হয়েছে।

**নিষিক্ত** — সিঞ্চিত।

**মুখপাত্র** — প্রধান প্রতিনিধি।

**রামগতি ন্যায়রত** — ১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দে জন্ম; মৃত্যু ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দে। মূলত প্রাচীনপন্থী ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'সংস্কৃত সাহিত্য প্রস্তাব'-এর অনুকরণে ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন।

**বিদ্যাসাগর**— প্রকৃত নাম ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা। জন্ম ১৮২০ খ্রিষ্টাব্দে; মৃত্যু ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দে। পিতার নাম বীরসিংহ শর্মা। বাংলার নবজাগরণের প্রাণপুরুষ এবং সমাজসংস্কারক। বিধবা বিবাহ প্রবর্তন, নারী শিক্ষা ও বহুবিবাহরদ আন্দোলনের পুরোধা। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি বাংলা গদ্যের জনক হিসেবে অভিহিত।

**আলালের ঘরের দুলাল**— প্যারীচাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুর প্রণীত বাংলা গদ্যগ্রন্থ; ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত। সংস্কৃতাশ্রয়ী গদ্যরীতিমুক্ত সরল মৌখিক ভাষায় রচিত। অত্যন্ত মধুর ও রসাল; শিক্ষিত স্বল্পশিক্ষিত সবার বোধগম্য। এই গ্রন্থে অনুসৃত ভাষারীতি পরবর্তীকালে 'আলালী ভাষা' নামে অভিহিত হয়।

**হুতোমপেঁচা** — কালীপ্রসন্ন সিংহ রচিত একটি গদ্যগ্রন্থ। প্রকৃত নাম 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'। ১৮৬২ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা অঞ্চলের কথ্যরীতি সমন্বিত ভাষায় রচিত। এর গদ্যরীতি 'আলালের ঘরের দুলালে'র সমপর্যায়ের।

**মৃণালিনী** — বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত উপন্যাস; ১৮৬৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত।

**বয়স্য** — সমবয়সী বন্ধু।

**টেকচাঁদি ভাষা** — প্যারীচাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুর অনুসৃত ভাষা।

## বস্তু-সংক্ষেপ

পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই লেখ্য ভাষা ও কথ্য ভাষার পার্থক্য বর্তমান। তবে বাংলায় এর প্রভেদ যতোটা ব্যাপক, অন্যভাষায় ততটা নয়। সাধু ভাষা ও অপর ভাষা এই দুই ভাগে বাংলা ভাষা বিভক্ত। প্রথম দিকে বাংলায় সাধুভাষায় লিখার কাজ সম্পন্ন হতো এবং সেখানে অপর ভাষার কোন রূপ চিহ্ন থাকতো না। অপর ভাষা মৌখিকভাবে ব্যবহার হতো। বিশেষ করে সাধুভাষায় অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দাবলি বাংলা ক্রিয়াপদের আদি রূপের সঙ্গে যুক্ত হয়। গদ্য গ্রন্থাদি সাধুভাষা ছাড়া রচিত হতো না। অনেকে মনে করতেন যে, সংস্কৃত ভাষা না জানলে বাংলা গ্রন্থ রচনা সম্ভব নয়। অপর ভাষা অপেক্ষাকৃত বোধগম্য হলেও পুস্তকাদিতে তার ব্যবহার দেখা যায়নি। ফলে কতিপয় পন্ডিতের সংস্কৃতপ্রিয়তা ও সংস্কৃতানুকারিতার জন্যে বাংলা সাহিত্য অত্যন্ত নীরস, শ্রীহীন, দুর্বল এবং বাঙালি সমাজে অপরিচিত হয়ে ওঠে। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত টেকচাঁদ ঠাকুর প্রথম কথোপকথনের ভাষা অর্থাৎ অপর ভাষায় 'আলালের ঘরের দুলাল' গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এরপর থেকে সাধুভাষা ও অপর ভাষা এই দুই প্রকার ভাষাতেই বাংলা গ্রন্থ রচিত হয়। তবে খাঁটি সংস্কৃতবাদী ও টেকচাঁদি পক্ষীয়দের মধ্যে এ নিয়ে তর্ক থেকে যায়। প্রথম পক্ষ মনে করেন যে, সংস্কৃতমূলক শব্দ ছাড়া বাংলায় অন্য শব্দ ব্যবহার ঘৃণার যোগ্য, দ্বিতীয় পক্ষের মত এই যে, সংস্কৃত শব্দের কচকচি প্রকৃত বাংলা নয়, তাই গ্রন্থে ব্যবহার হতে পারে না। পন্ডিত রামগতি ন্যায়রত্নকে সংস্কৃতবাদীদের মুখপাত্র হিসেবে অভিহিত করে প্রবন্ধকার তাঁর গদ্যভাবনা বিচারে অবতীর্ণ হয়েছেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় সংস্কৃত-সুপন্ডিত হলেও ইংরেজি জানেন না। তাঁর মতে, 'আলালের ঘরের দুলাল', 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' ইত্যাদি পিতাপুত্র একত্রে অসঙ্কুচিত চিত্তে পাঠ করা চলে না — বন্ধু বা পত্নীর সঙ্গে পাঠ করে আমোদ করা চলে। কারণ ওই ভাষাতে 'কেমন একরূপ ভঙ্গী আছে' যে কারণে তা গুরুজনসমক্ষে উচ্চারণে লজ্জাবোধ হয়। এ জন্যে ওই ভাষা পাঠ্যপুস্তকে শিক্ষাপ্রদও নয়। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মতো সংস্কৃতবাদীদের মত পুরোপুরি মান্য করলে 'মাগো আমাকে খাবার দাও' — এই সাধারণ বাংলা বাক্যটি 'হে মাতঃ খাদ্যং দেহি মে' বলতে হয়। বুঝার ক্ষেত্রে যেহেতু বাক্যটি কষ্টসাধ্য, সেহেতু শিক্ষার ব্যাপরটিও এখানে গৌণ হয়ে যায়। ন্যায়রত্ন মহাশয় সংস্কৃতশব্দবহুল গদ্যের কথা বললেও তাঁর রচিত 'বাঙ্গালা সাহিত্য' বিষয়ক প্রস্তাব কিন্তু সরল প্রচলিত ভাষায় লিখিত।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন

### সংক্ষিপ্ত-উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. বঙ্কিমচন্দ্র 'সাধুভাষা' ও 'অপর ভাষা' বলতে কি বুঝিয়েছেন?
২. রামগতি ন্যায়রত্নের মতে বাংলা গদ্য কেমন হওয়া উচিত?

### ২ নং সংক্ষিপ্ত-উত্তর-প্রশ্নের নমুনা-উত্তরঃ

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রামগতি ন্যায়রত্নকে সংস্কৃতবাদীদের মুখপাত্র হিসেবে অভিহিত করেছেন। ন্যায়রত্ন সংস্কৃতে সুপন্ডিত, কিন্তু ইংরেজি জানেন না। তিনি বাংলা ভাষায় সংস্কৃত শব্দাধিক্য ও সমাসবদ্ধ পদ আমদানির পক্ষপাতী। 'আলালের ঘরের দুলাল' বা 'হুতোম পেঁচার নক্সা' পাঠ করলে লজ্জা জন্মে বলে তিনি মনে করেন। আভাঙ্গা অর্থাৎ খাঁটি সংস্কৃত শব্দ ছাড়া অন্য শব্দ প্রাচীনপন্থীরা বাংলা গদ্যে অন্তর্ভুক্ত করার বিপক্ষে। যাদের সংস্কৃতে দখল নেই, তাদের বাংলা গ্রন্থ প্রণয়নের অধিকার নেই — প্রাচীনপন্থীদের এই মতই ছিলো রামগতি ন্যায়রত্নের মত।

### প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ব্যাখ্যা লিখুন

১. অন্যের বোধ ছিল যে সংস্কৃত না জানে, বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রণয়নে তাহার কোন অধিকার নাই, সে বাঙ্গালা লিখিতে পারেই না।
২. সুতরাং বাঙ্গালায় রচনা ফোঁটা-কাটা অনুস্বারবাদীদিগের একচেটিয়া মহল ছিল।

### ১ নং ব্যাখ্যার নমুনা-উত্তরঃ

আলোচ্য বাক্যটি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'বাঙ্গালা ভাষা' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে চয়ন করা হয়েছে। এখানে সংস্কৃত পন্ডিতদের মতে বাংলা ভাষার আদর্শ ও রূপ কি হওয়া উচিত সে কথা প্রবন্ধকার ব্যক্ত করেছেন।

উইলিয়াম কেরীর কথ্যভাষায় আশ্রয়, রামরাম বসুর আরবী-ফারসী শব্দ-নির্ভরতা আর মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের সংস্কৃত ভাষারীতি অবলম্বন — এই ত্রয়ী ধারায় বাংলা গদ্যরীতির প্রাথমিক সূচনা হয়। কিন্তু দীর্ঘদিন পর্যন্ত বাংলা ভাষা, বিশেষত বাংলা গদ্যের আদর্শ ও রূপ কোন নির্দিষ্টতা নিয়ে স্বীকৃত হয়ে ওঠেনি। গ্রন্থাদি সাধুভাষায় প্রণীত হতো এবং এর প্রণেতা ছিলেন মূলত সংস্কৃত পন্ডিতগণ। তাঁরা স্বভাবতই বাংলা ভাষাকে সংস্কৃত শব্দ ও রীতি নির্ভর করে গড়ে তোলার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁদের বক্তব্য হলো, বাংলা ভাষায় সংস্কৃত প্রভাব অবশ্যই থাকতে হবে এবং সংস্কৃত প্রভাব অস্বীকার করে বাংলা গ্রন্থ রচিত হতে পারবে না। এই অভিমতটি এক সময় এতোটা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় যে, ধারণা জন্মে, যাঁরা সংস্কৃত ভাষা ও ব্যাকরণ জানেন না, তাঁরা বাংলা পুস্তক লিখতেই পারেন না। সংস্কৃত পন্ডিতদের এই বক্তব্যটি অবশ্য পরবর্তীকালে ব্যর্থ প্রমাণিত হয়।

**পাঠ-১.২**

## উদ্দেশ্য

## এ পাঠ শেষে আপনি —

- বাংলা ভাষা-প্রশ্নে শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের অভিমত বর্ণনা করতে পারবেন।
- হুতোমি-ভাষা গ্রন্থ রচনায় কেন পরিত্যাজ্য হওয়া উচিত, সে কথা প্রকাশ করতে পারবেন।
- বাংলা ভাষার আদর্শরূপ প্রশ্নে বঙ্গিমচন্দ্রের অভিমত ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

# মূলপাঠ

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মত সমালোচনায় আর অধিক কাল হরণ করিবার আমাদিগের ইচ্ছা নাই। আমরা এক্ষণে সুশিক্ষিত অথবা নব্য সম্প্রদায়ের মত সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব। এই সম্প্রদায়ের সকলের মত একরূপ নহে। ইহার মধ্যে একদল এমন আছেন যে, তাঁহারা কিছু বাড়াবাড়ি করিতে প্রস্তুত। তন্মধ্যে বাবু শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় গত বৎসর কলিকাতা রিভিউতে বাঙ্গালা ভাষার বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। প্রবন্ধটি উৎকৃষ্ট। তাঁহার মতগুলি অনেক স্থলে সুসঙ্গত এবং আদরণীয়। অনেক স্থলে তিনি কিছু বেশী গিয়াছেন। বহুবচন জ্ঞাপনে গণ শব্দ ব্যবহার করার প্রতি তাহার কোপদৃষ্টি। বাঙ্গালায় লিঙ্গভেদ তিনি মানেন না। পৃথিবী যে বাঙ্গালায় স্ত্রীলিঙ্গ বাচক শব্দ, ইহা তাঁহার অসহ্য। বাঙ্গালায় সন্ধি তাঁহার চক্ষুঃশূল। বাঙ্গালায় তিনি 'জনৈক' লিখিতে দিবেন না। ত্ব প্রত্যয়ান্ত এবং য প্রত্যয়ান্ত শব্দ ব্যবহার করিতে দিবেন না। সংস্কৃত সংখ্যাবাচক শব্দ, যথা — একাদশ বা চত্বারিংশত বা দুইশত ইত্যাদি বাঙ্গালায় ব্যবহার করিতে দিবেন না। ভ্রাতা, কল্য, কর্ণ, তাম্র, স্বর্ণ, পত্র, মস্তক, অশ্ব ইত্যাদি শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহার করিতে দিবেন না। ভাই, কাল, কান, সোনা কেবল এই সকল শব্দ ব্যবহার হইবে। এইরূপ তিনি বাঙ্গালা ভাষার উপর অনেক দৌরাত্ম্য করিয়াছেন। তথাপি তিনি এই প্রবন্ধে বাঙ্গালাভাষা সম্বন্ধে অনেকগুলি সারগর্ভ কথা বলিয়াছেন। বাঙ্গালা লেখকেরা তারা স্মরণ রাখেন, ইহা আমাদের ইচ্ছা।

শ্যামাচরণ বাবু বলিয়াছেন এবং সকলেই জানেন যে, বাঙ্গালা শব্দ ত্রিবিধ — প্রথম, সংস্কৃতমূলক শব্দ, যাহার বাঙ্গালায় রূপান্তর হইয়াছে, যথা — গৃহ হইতে ঘর, ভ্রাতা হইতে ভাই। দ্বিতীয় — সংস্কৃতমূলক শব্দ, যাহার রূপান্তর হয় নাই। যথা — জল, মেঘ, সূর্য। তৃতীয়, যে সকল শব্দের সংস্কৃতের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই।

প্রথম শ্রেণীর শব্দ সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, রূপান্তরিত প্রচলিত সংস্কৃতমূলক শব্দের পরিবর্তে কোন স্থানেই অরূপান্তরিত মূল সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করা কর্তব্য নহে, যথা — মাথার পরিবর্তে মস্তক, বামনের পরিবর্তে ব্রাহ্মণ ইত্যাদি ব্যবহার করা কর্তব্য নহে। আমরা বলি যে, এক্ষণে বামনও যেমন প্রচলিত ব্রাহ্মণও সেইরূপ প্রচলিত; পাতাও যেরূপ প্রচলিত, পত্র ততদূর না হউক, প্রায় সেইরূপ প্রচলিত। ভাই যেরূপ প্রচলিত, ভ্রাতা ততদূর না হউক, প্রায় সেইরূপ প্রচলিত। যাহা প্রচলিত হইয়াছে, তাহা উচ্ছেদে কোন ফল নাই, এবং উচ্ছেদ সম্ভবও নহে। কেহ যত্ন করিয়া মাতা, পিতা, ভ্রাতা, গৃহ, তাম্র বা মস্তক ইত্যাদি শব্দকে বাঙ্গালা ভাষা হইতে বহিষ্কৃত করিতে পারিবেন না। আর বহিষ্কৃত করিয়াই বা ফল কি? এ বাঙ্গালাদেশে কোন চাষা আছে যে, ধান্য, পুষ্করিণী, গৃহ বা মস্তক ইত্যাদি শব্দের অর্থ বুঝে না। যদি সকলে বুঝে তবে কি দোষে এই শ্রেণীর শব্দগুলি বধার্হ? বরং ইহাদের পরিত্যাগে ভাষা কিংদংশে ধনশূন্য হইবে মাত্র। নিষ্কারণ ভাষাকে ধনশূন্য করা কোন ক্রমে বাঞ্ছনীয় নহে। আর কতগুলি এমন শব্দ আছে যে তাহাদের রূপান্তর ঘটিয়াছে আপাতত বোধ হয়, কিন্তু বাস্তবিক রূপান্তর ঘটে নাই, কেবল সাধারণের উচ্চারণের বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। সকলেই উচ্চারণ করে "খেউরি," কিন্তু ক্ষৌরী লিখিলে সকলে বুঝে যে, এই সেই 'খেউরি' শব্দ। এ স্থলে ক্ষৌরীকে পরিত্যাগ করিয়া খেউরি প্রচলিত করায় কোন লাভ নাই। বরং এমত স্থলে আদিম সংস্কৃত রূপটি বজায় রাখিলে ভাষার স্থায়িত্ব জন্মে। কিন্তু এমন অনেকগুলি শব্দ আছে যে, তাহার আদিম রূপ সাধারণের প্রচলিত বা সাধারণের বোধগম্য নহে — তাহার অপভ্রংশই প্রচলিত এবং সকলের বোধগম্য। এমত স্থলেই আদিম রূপ কদাচ ব্যবহার্য নহে।

যদিও আমরা এমন বলি না যে, "ঘর" প্রচলিত আছে বলিয়া গৃহ শব্দের উচ্ছেদ করিতে হইবে, অথবা মাথা শব্দ প্রচলিত আছে বলিয়া মস্তক শব্দের উচ্ছেদ করিতে হইবে; কিন্তু আমরা এমত বলি যে, অকারণে ঘর শব্দের পরিবর্তে গৃহ, অকারণে মাথার পরিবর্তে মস্তক, অকারণে পাতার পরিবর্তে পত্র এবং তামার পরিবর্তে তাম্র ব্যবহার করা উচিত নহে।

কেন না, ঘর, মাথা, পাতা, তামা বাঙ্গালা; আর গৃহ, মস্তক, পত্র, তাম্র সংস্কৃত। বাঙ্গালা লিখিতে গিয়া অকারণে বাঙ্গালা ছাড়িয়া সংস্কৃত কেন লিখিব? আর দেখা যায় যে, সংস্কৃত ছাড়িয়া বাঙ্গালা শব্দ ব্যবহার করিলে রচনা অধিকতর মধুর, সুস্পষ্ট ও তেজস্বী হয়। "হে ভ্রাতঃ" বলিয়া যে ডাকে, বোধ হয় যেন সে যাত্রা করিতেছে, "ভাইরে" বলিয়া যে ডাকে, তাহার ডাকে মন উছলিয়া উঠে। অতএব আমার ভ্রাতা শব্দ উঠাইয়া দিতে চাই না বটে, কিন্তু সচরাচর আমার ভাই শব্দটি ব্যবহার করিতে চাই। ভ্রাতা শব্দ রাখিতে চাই, তাহার কারণ এই যে, সময়ে সময়ে তদ্ব্যবহারে বড় উপকার হয়। "ভ্রাতৃভাব" এবং "ভাইভাব," "ভ্রাতৃত্ব" এবং "ভাইগিরি" এতদুভয়ের তুলনায় বুঝা যাইবে যে, কেন ভ্রাতৃ শব্দ বাঙ্গালায় বজায় রাখা উচিত। এই স্থলে বলিতে হয় যে, আজিও অকারণে প্রচলিত বাঙ্গালা ছাড়িয়া সংস্কৃত ব্যবহারে অনেক লেখকের বিশেষ অনুরক্তি আছে। অনেক বাঙ্গালা রচনা যে নীরস নিস্তেজ এবং অস্পষ্ট, ইহাই তাহার কারণ।

দ্বিতীয় শ্রেণীর শব্দ, অর্থাৎ যে সকল সংস্কৃত শব্দ রূপান্তর না হইয়াই বাঙ্গালায় প্রচলিত আছে, তৎসম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার নাই। তৃতীয় শ্রেণীর অর্থাৎ যে সকল শব্দ সংস্কৃতের সহিত সম্বন্ধশূন্য, তৎসম্বন্ধে শ্যামাচরণ বাবু যাহা বলিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত সারগর্ভ এবং আমরা তাহার সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। সংস্কৃতপ্রিয় লেখকদিগের অভ্যাস সে, এই শ্রেণীর শব্দ সকল তাঁহারা রচনা হইতে একেবারে বাহির করিয়া দেন। অন্যের রচনায় যে সকল শব্দের ব্যবহার শেলের ন্যায় তাহাদিগকে বিদ্ধ করে। ইহার পর মূর্খতা আমরা আর দেখি না। যদি কোন ধনবান ইংরেজের অর্থভান্ডারে হালি এবং বাদশাহী দুই প্রকার মোহর থাকে, এবং সেই ইংরেজ যদি জাত্যাভিমানের বশ হইয়া বিবির মাথাওয়ালা মোহর রাখিয়া, ফার্সি লেখা মোহরগুলি ফেলিয়া দেয়, তবে সকলেই সেই ইংরেজকে ঘোরতর মূর্খ বলিবে। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে, এই পন্ডিতেরা সেই মত মূর্খ।

তাহার পরে অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দকে বাঙ্গালা ভাষায় নূতন সন্নিবেশিত করার ঔচিত্য বিচার্য। দেখা যায়, লেখকেরা ভূরি ভূরি অপ্রচলিত নূতন সংস্কৃত শব্দ প্রয়োজনে বা নিষ্প্রয়োজনে ব্যবহার করিয়া থাকেন। বাঙ্গালা আজিও অসম্পূর্ণ ভাষা, তাহার অভাব পূরণ জন্য অন্য অন্য ভাষা হইতে সময়ে সময়ে শব্দ কর্জ করিতে হইবে। কর্জ করিতে হইলে, চিরকেলে মহাজন সংস্কৃতের কাছেই ধার করা কর্তব্য। প্রথমতঃ, সংস্কৃত মহাজনই পরম ধনী; ইহার রত্নময় শব্দভাণ্ডার হইতে যাহা চাও, তাহাই পাওয়া যায়; দ্বিতীয়তঃ, সংস্কৃত হইতে শব্দ লইলে, বাঙ্গালার সঙ্গে ভাল মিশে। বাঙ্গালার অস্থি, মজ্জা, শোনিত, মাংস সংস্কৃতেই গঠিত। তৃতীয়তঃ, সংস্কৃত হইতে নূতন শব্দ লইলে, অনেকে বুঝিতে পারে; ইংরেজি বা আরবী হইতে লইলে কে বুঝিবে? "মাধ্যাকর্ষণ" বলিলে কতক অর্থ অনভিজ্ঞ লোকেও বুঝে। "গ্রাবিটেশন্" বলিলে ইংরেজি যাহারা না বুঝে, তাহারা কেহই বুঝিবে না। অতএব যেখানে বাঙ্গালা শব্দ নাই, সেখানে অবশ্য সংস্কৃত হইতে অপ্রচলিত শব্দ গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু নিষ্প্রয়োজনে অর্থাৎ বাঙ্গালা শব্দ থাকিতে তদ্বাচক অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার যাঁহারা করেন, তাঁহাদের কিরূপ রুচি, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

স্থূল কথা, সাহিত্য কি জন্য? গ্রন্থ কি জন্য? যে পড়িবে, তাহার বুঝিবার জন্য। না বুঝিয়া, বহি বন্ধ করিয়া, পাঠক ত্রাহি ত্রাহি করিয়া ডাকিবে, বোধ হয় এ উদ্দেশ্যে কেহ গ্রন্থ লিখে না। যদি এ কথা সত্য হয়, তবে যে ভাষা অধিকাংশ লোকের বোধগম্য — অথবা যদি সকলের বোধগম্য কোন ভাষা না থাকে, তবে যে ভাষা অধিকাংশ লোকের বোধগম্য তাহাতেই গ্রন্থ প্রণীত হওয়া উচিত। যদি কোন লেখকের এমন উদ্দেশ্য থাকে যে, আমার গ্রন্থ দুই চারিজন শব্দপন্ডিতে বুঝুক, আর কাহারও বুঝিবার প্রয়োজন নাই, তবে তিনি গিয়া দুরূহ ভাষায় গ্রন্থপ্রণয়নে প্রবৃত্ত হউন। যে তাঁহার যশ করে করুক, আমরা কখন যশ করিব না। তিনি দুই একজনের উপকার করিলে করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাকে পরোপকারকাতর খলস্বভাব পাখন্ড বলিব। তিনি জ্ঞানবিতরণে প্রবৃত্ত হইয়া, চেষ্টা করিয়া অধিকাংশ পাঠককে আপনার জ্ঞানভান্ডার হইতে দূরে রাখেন। যিনি যথার্থ গ্রন্থকার, তিনি জানেন যে, পরোপকার ভিন্ন গ্রন্থপ্রণয়নের উদ্দেশ্য নাই; জনসাধারণের জ্ঞানবৃদ্ধি বা চিত্তোন্নতি ভিন্ন রচনার অন্য উদ্দেশ্য নাই; অতএব যত অধিক ব্যক্তি গ্রন্থের মর্ম গ্রহণ করিতে পারে, ততই অধিক ব্যক্তি উপকৃত — ততই গ্রন্থের সফলতা। জ্ঞানে মনুষ্যমাত্রেরই তুল্যাধিকার। যদি সে সর্বজনের প্রাপ্য ধনকে, তুমি এমত দুরূহ ভাষায় নিবন্ধ রাখ যে, কেবল যে কয়জন পরিশ্রম করিয়া সেই ভাষা শিখিয়াছে, তাহারা ভিন্ন আর কেহ তাহা পাইতে পারিবে না, তবে তুমি অধিকাংশ মনুষ্যকে তাহাদিগের স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করিলে। তুমি সেখানে বঞ্চক মাত্র।

তাই বলিয়া আমরা এমত বলিতেছি না যে, বাঙ্গালার লিখন পঠন হুতোমি ভাষায় হওয়া উচিত। তাহা কখন হইতে পারে না। যিনি যত চেষ্টা করুন, লিখনের ভাষা এবং কথনের ভাষা চিরকাল স্বতন্ত্র থাকিবে। কারণ, কথনের এবং লিখনের উদ্দেশ্য ভিন্ন। কথনের উদ্দেশ্য কেবল সামান্য জ্ঞাপন, লিখনের উদ্দেশ্য শিক্ষাদান, চিত্ত সঞ্চালন। এই মহৎ উদ্দেশ্য হুতোমি ভাষায় কখন সিদ্ধ হইতে পারে না। হুতোমি ভাষা দরিদ্র, ইহার তত শব্দধন নাই; হুতোমি ভাষা নিস্তেজ, ইহার তেমন বাঁধন নাই; হুতোমি ভাষা অসুন্দর এবং যেখানে অশীল নয়, সেখানে পবিত্রতাশূন্য। হুতোমি ভাষায় কখন গ্রন্থ প্রণীত হওয়া কর্তব্য নহে। যিনি হুতোমপেঁচা লিখিয়াছিলেন, তাঁহার রুচি বা বিবেচনার প্রশংসা করি না।

টেকচাঁদি ভাষা, হুতোমি ভাষার এক পৈঠা উপর। হাস্য ও করুণরসের ইহা বিশেষ উপযোগী। স্কচ্ কবি বর্ণস্ হাস্য ও করুণ রসাত্মিকা কবিতায় স্কচ্ ভাষা ব্যবহার করিতেন, গম্ভীর এবং উন্নত বিষয়ে ইংরেজি ব্যবহার করিতেন। গম্ভীর এবং উন্নত বা চিন্তাময় বিষয়ে টেকচাঁদি ভাষায় কুলায় না। কেন না, এ ভাষাও অপেক্ষাকৃত দরিদ্র, দুর্বল এবং অপরিমার্জিত।

অতএব ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হইতেছে যে, বিষয় অনুসারেই রচনার ভাষার উচ্চতা বা সামান্যতা নির্ধারিত হওয়া উচিত। রচনার প্রধান গুণ এবং প্রথম প্রয়োজন, সরলতা এবং স্পষ্টতা। যে রচনা সকলেই বুঝিতে পারে, এবং পড়িবামাত্র যাহার অর্থ বুঝা যায়, অর্থগৌরব থাকিলে তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট রচনা। তাহার পর ভাষার সৌন্দর্য, সরলতা এবং স্পষ্টতার সহিত সৌন্দর্য মিশাইতে হইবে। অনেক রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্য — সে স্থলে সৌন্দর্যের অনুরোধে শব্দের একটু অসাধারণতা সহ্য করিতে হয়। প্রথমে দেখিবে, তুমি যাহা বলিতে চাও, কোন্ ভাষায় তাহা সর্বাপেক্ষা পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত হয়। যদি সরল প্রচলিত কথাবার্তার ভাষায় তাহা সর্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট এবং সুন্দর হয়, তবে কেন উচ্চ ভাষার আশ্রয় লইবে? যদি সে পক্ষে টেকচাঁদি বা হুতোমি ভাষায় সকলের অপেক্ষা কার্য সুসিদ্ধ হয়, তবে তাহাই ব্যবহার করিবে। যদি তদপেক্ষা বিদ্যাসাগর বা ভূদেববাবুপ্রদর্শিত সংস্কৃতবহুল ভাষায় ভাবের অধিক স্পষ্টতা এবং সৌন্দর্য হয়, তবে সামান্য ভাষা ছাড়িয়া সেই ভাষার আশ্রয় লইবে। যদি তাহাতেও কার্য সিদ্ধ না হয়, আরও উপরে উঠিবে; প্রয়োজন হইলে তাহাতেও আপত্তি নাই — নিষ্প্রয়োজনেই আপত্তি। বলিবার কথাগুলি পরিস্ফুট করিয়া বলিতে হইবে — যতটুকু বলিবার আছে, সবটুকু বলিবে — তজ্জন্য ইংরেজি, ফার্সি, আরবি, সংস্কৃত, গ্রাম্য, বন্য, যে ভাষার শব্দ প্রয়োজন তাহা গ্রহণ করিবে, অশীল ভিন্ন কাহাকেও ছাড়িবে না। তারপর সেই রচনাকে সৌন্দর্য-বিশিষ্ট করিবে — কেন না, যাহা অসুন্দর, মনুষ্যচিত্তের উপরে তাহার শক্তি অল্প। এই উদ্দেশ্যগুলি যাহাতে সরল প্রচলিত ভাষায় সিদ্ধ হয়, সেই চেষ্টা দেখিবে — লেখক যদি লিখিতে জানেন, তবে সে চেষ্টা প্রায় সফল হইবে। আমরা দেখিয়াছি, সরল প্রচলিত ভাষা অনেক বিষয়ে সংস্কৃতবহুল ভাষার অপেক্ষা শক্তিমতী। কিন্তু যদি সে সরল প্রচলিত ভাষায় সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হয়, তবে কাজে কাজেই সংস্কৃতবহুল ভাষার আশ্রয় লইতে হইবে। প্রয়োজন হইলে নিঃসঙ্কোচে সে আশ্রয় লাইবে।

ইহাই আমাদের বিবেচনায় বাঙ্গালা রচনার উৎকৃষ্ট রীতি। নব্য ও প্রাচীন উভয় সম্প্রদায়ের পরামর্শ ত্যাগ করিয়া, এই রীতি অবলম্বন করিলে, আমাদিগের বিবেচনায় ভাষা শক্তিশালিনী, শব্দৈশ্বর্যে পুষ্টা এবং সাহিত্যালঙ্কারে বিভূষিতা হইবে।

◆ ◆

## শব্দার্থ ও টীকা

**শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়**— বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সমকালে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত সুপন্ডিত ব্যক্তি। বাংলা ভাষার উন্নতিকল্পে তিনি নিরলস প্রচেষ্টা করেন এবং ভাষাকে অপেক্ষাকৃত সরল ও গতিশীল করার ব্যাপারে কার্যকর ভূমিকা রাখেন। এ ব্যাপারে 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় — যার উলেখ বঙ্কিমচন্দ্র এ প্রবন্ধে করেছেন। শ্যামচরণ বাংলা ভাষায় সংস্কৃত ভাষারীতি এবং দীর্ঘ সমাসবদ্ধপদ ব্যবহারের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন।
**কোপদৃষ্টি**— অসন্তুষ্টি, বিরাগভাব।
**চক্ষুঃশূল**— দর্শন করলে বিরক্তি জন্মে এমন (কিছু)।
**চত্বারিংশত**— চলিশ।
**দৌরাত্ম্য**— উৎপীড়ন, অত্যাচার।
**সারগর্ভ**— উৎকৃষ্টগুণ বা ধর্মযুক্ত। এখানে উপদেশপূর্ণ বক্তব্য।
**ত্রিবিধ**— তিন প্রকার। এখানে বাংলা ভাষায় তিন প্রকার শব্দের কথা বলা হয়েছে। যথা: সংস্কৃত, সংস্কৃতজাত, সংস্কৃত নয় এমন শব্দ।
**পুষ্করিণী**— পুকুর, সরোবর।
**বধার্হ** — বধ বা হত্যার যোগ্য, বধ করতে হবে এমন।
**বৈলক্ষণ্য**— প্রকারান্তর, ভাবের পরিবর্তন।
**ক্ষৌরী**— ক্ষুর কর্ম।
**হালি এবং বাদশাহী দুই প্রকার মোহর**— হাল আমলের অর্থাৎ তৎকালীন ইংরেজ আমলের রাণী ভিক্টোরিয়ার মুখাঙ্কিত মোহর এবং বাদশাহী আমল অর্থাৎ পূর্বকালীন ফার্সি অক্ষর মুদ্রিত মোহর।
**সন্নিবেশিত**— সংযোজিত।
**সংস্কৃত মহাজনই পরম ধনী** — এখানে সংস্কৃত ভাষার ঐশ্বর্যের কথা বলা হয়েছে। শব্দ প্রাচুর্য ও ব্যাকরণের নিয়ম-সুসংবদ্ধতায় সংস্কৃতভাষা বিশেষভাবে ঋদ্ধ।
**মাধ্যাকর্ষণ** — জড়পদার্থের পরস্পর আকর্ষণশক্তি, যার ফলে পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী ও পদার্থ পৃথিবী-পৃষ্ঠে স্থির থাকে এবং পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে আকৃষ্ট হয়।
**তুল্যাধিকার** — সমান অধিকার।

**হুতোমি ভাষা —** কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁর 'হুতোম প্যাঁচার নকশা', (১৮৬২) গ্রন্থে কলিকাতা অঞ্চলের কথ্যরীতি প্রায় অবিকৃতভাবে গ্রহণ করেন। এই গ্রন্থে অনুসৃত ভাষারীতিকেই হুতোমি ভাষা বলা হয়।
**স্কচ্ কবি বর্ণস্ —** জন্ম ১৭৫৯ খ্রিষ্টাব্দে; মৃত্যু ১৭৯৬ খ্রিষ্টাব্দে। স্কটল্যান্ডের বিখ্যাত কবি। শিক্ষা শেষ করে প্রথম জীবনে তিনি কৃষিকাজে মনোনিবেশ করেন। গীতিকবিতা রচনার জন্য ইংরেজি সাহিত্যে তিনি বিশিষ্ট হয়ে আছেন। রসাত্মক লঘু কবিতা তিনি স্কচ্ভাষায় রচনা করতেন, কিন্তু ভাবগম্ভীর কবিতা রচনার জন্যে বেছে নিতেন ইংরেজি ভাষা।
**ভূদেববাবু —** প্রকৃত নাম ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। জন্ম ১৮১৬ খ্রিষ্টাব্দে, মৃত্যু ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দে। বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ও গদ্যলেখক হিসেবে খ্যাতিমান। বিশেষ করে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে তাঁর দান অনস্বীকার্য। গদ্য রচনায় তিনি অধিকতর সংস্কৃতমুখী ছিলেন।

## বস্তুসংক্ষেপ

অপর ভাষা অর্থাৎ কথ্যভাষায় গদ্যচর্চাকারীদের প্রবন্ধকার নব্য সম্প্রদায় হিসেবে উলেখ করে বাংলা গদ্য সম্পর্কে তাদের অভিমত যাচাই করেছেন। শ্যামাচারণ গঙ্গোপাধ্যায়কে এদের প্রতিনিধি হিসেবে ধরা হয়েছে। শ্যামাচারণ বাবু ১২৮৪ বঙ্গাব্দে কলিকাতা রিভিউ পত্রিকায় বাংলা ভাষা বিষয়ে লিখিত একটি প্রবন্ধে উলেখ করেছেন যে, বাংলায় বহুবচন-বাচক 'গণ', জনৈক শব্দ, ত্ব ও য প্রত্যয়ান্ত শব্দ, সন্ধির ব্যবহার, সংস্কৃত সংখ্যাবাচক শব্দ যথা — একাদশ, বা চত্বারিংশত ইত্যাদি পরিত্যাজ্য। শব্দের লিঙ্গভেদ করা যাবে না। এমন কি বহু ব্যবহৃত হওয়া সত্ত্বেও ভ্রাতা, কর্ণ, তাম্র, স্বর্ণ, পত্র, মস্তক, অশ্ব ইত্যাদি শব্দ পরিত্যাগ করতে হবে। শ্যামাচরণ বাবুর বক্তব্য অনুসারে 'ভ্রাতৃভাব' শব্দটি 'ভাইভাব' লিখতে হয় কিংবা 'ভ্রাতৃত্ব' হয়ে যায় 'ভাইগিরি'। এতে বাংলা রচনা নিরস, নিস্তেজ এবং অস্পষ্ট হয়ে যায়। আসলে শ্যামাচরণ বাবু ভাষার উপকার করতে গিয়ে তার উপর দৌরাত্ম করেছেন। যে বাঙালি মাথা, ভাই কিংবা ঘর বুঝেন, তিনি মস্তক, ভ্রাতা, গৃহও বুঝেন। অতএব অকারণে বহুব্যবহৃত এই সংস্কৃত শব্দগুলোকে বহিষ্কার করে বাংলা ভাষাকে সম্পদহীন করবার কোন সার্থকতা নেই। বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেন যে, যেখানে সংস্কৃত শব্দ ভাবপ্রকাশে সহায়ক সেখানে তার ব্যবহার আবশ্যিক হওয়া উচিত।

অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দকে বাংলা ভাষায় সন্নিবেশত করা যেমন নিষ্প্রয়োজন, তেমনি বিনা বিচারে সংস্কৃত শব্দ বর্জনও অনুচিত বলে প্রবন্ধকার মনে করেন। ভাবপ্রকাশের জন্যে যদি ক্ষেত্র-বিশেষে বিদেশি ভাষা থেকে শব্দ ঋণ করতে হয় তবে সংস্কৃত ভাষারস্নারস্থ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কারণ সংস্কৃত শব্দসম্পদে মহাজন এবং বাংলা ভাষার নিকটস্থীয়ও বটে। পাঠকের বোধগম্যতা সাহিত্যের প্রধান শর্ত। পরোপকার তথা জনসাধারণের জ্ঞানবৃদ্ধি বা চিত্তোন্নতি গ্রন্থরচনার প্রধান উদ্দেশ্য।

অতএব, যে ভাষায় গ্রন্থরচনা করলে অধিক ব্যক্তি তার মর্ম গ্রহণ করতে পারে সে ভাষাতেই গ্রন্থ রচিত হওয়া উচিত। তাই বলে হুতোমি ভাষা এক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ ওই ভাষা নিস্তেজ, অসুন্দর, শব্দদারিদ্র্যপূর্ণ এবং অনেক ক্ষেত্রে পবিত্রতাশূন্য। কথনের উদ্দেশ্য সামান্য জ্ঞাপন কিন্তু লিখনের উদ্দেশ্য শিক্ষাদান ও চিত্ত সঞ্চালন। এ জন্যেই হুতোমি ভাষা পরিত্যাজ্য হওয়া উচিত। টেকচাঁদি ভাষা হুতোমি ভাষা অপেক্ষা সামান্য উন্নত। তবে এতে হাস্যরস সৃষ্টি করা গেলেও গম্ভীর ও উন্নত ভাবপ্রকাশ অসম্ভব। বঙ্কিমচন্দ্রের সিদ্ধান্ত, বিষয় অনুসারেই রচনার ভাষার উচ্চতা বা সামান্যতা নির্ধারিত হওয়া উচিত। সরলতা এবং স্পষ্টতাই রচনার প্রধান গুণ ও প্রথম প্রয়োজন। এর সঙ্গে সৌন্দর্যের সংমিশ্রণের ফলে রচনা সর্বোৎকৃষ্ট হয়ে ওঠে। তবে বক্তব্যে বিষয়ের চাহিদা অনুসারে টেকচাঁদি বা হুতোমি কিংবা বিদ্যাসাগরি বা ভূদেবিয় সংস্কৃতবহুল ভাষা ক্ষেত্র বিশেষে ব্যবহার হতে পারে। কারণ বলার কথাগুলো পরিস্ফুট ও সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করাই প্রধান উদ্দেশ্য। এ জন্যে সংস্কৃত, আরবি, গ্রাম্য, বন্য যে-কোন ধরনের শব্দ গ্রহণ করা যেতে পারে। শুধুমাত্র অশীল শব্দাবলী পরিত্যাজ্য। কারণ অসুন্দর মনুষ্যচিত্তে স্থায়ী আসন লাভ করতে পারে না। সরল ভাষাও সংস্কৃত ভাষা অপেক্ষা কখনো শক্তিমতী হয়ে ওঠে। যদি ওই ভাষাতে প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হয় তবে নিঃসঙ্কোচে সংস্কৃতভাষার আশ্রয় গ্রহণ করা যেতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেন যে, সাহিত্য সৃষ্টির ব্যাপারে সব ধরনের গোঁড়ামি ও একগুয়েমি ত্যাগ করে রচনার প্রয়োজন এবং বিষয়বস্তু অনুসারে ভাষা ব্যবহার করা উচিত। তিনি নব্য ও প্রাচীন উভয় সম্প্রদায়ের পরামর্শ ত্যাগ করে ভাষা শক্তিশালী, শব্দের ঐশ্বর্যে পুষ্ট এবং সাহিত্যালঙ্কারে ভূষিত করার লক্ষ্যে এ মধ্যপথ অবলম্বনের কথা বলেন।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন

**সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের উত্তর লিখুন**

১. শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় বাংলা ভাষা থেকে কি কি জিনিস বাদ দিতে চান?
২. 'হুতোমি ভাষা গ্রন্থ রচনায় পরিত্যাজ্য হওয়া প্রয়োজন' — কেন?
৩. বঙ্কিমচন্দ্রের মতে রচনার ভাষার উচ্চতা বা সামান্যতা কিসের উপর নির্ভরশীল হওয়া উচিত?

**২ নং সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের নমুনা-উত্তর**

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মনে করেন যে, কথনের উদ্দেশ্য কেবল অল্পকিছু ব্যক্ত করা, আর লিখনের উদ্দেশ্য হলো লোকশিক্ষাদান ও মনোজগতের সুশীল বিকাশ সাধন। এ-কারণে তিনি হুতোমি ভাষায় গ্রন্থরচনাকে পরিত্যাজ্য মনে করেছেন। কারণ, আলালি গদ্যের চেয়েও হুতোমি গদ্য নিচুমানের বলে তাঁর মত। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন যে, হুতোমি ভাষা দরিদ্র, শব্দধনহীন। এই ভাষা যথেষ্ট নিস্তেজ, শিথিল। এখানে সৌন্দর্য ও শীলতা বলে কিছু নেই — আর তাই এখানে পবিত্রতাও থাকতে পারে না। এই ভাষা পাঠ করলে রুচির স্খলন ঘটে। এ সব কারণে বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেন যে, হুতোমি ভাষা গ্রন্থ রচনায় পরিত্যাজ্য হওয়া প্রয়োজন।

**প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ব্যাখ্যা করুন**

১. যে ভাষা বাঙ্গালা সমাজে প্রচলিত, যাহাতে বাঙ্গালার নিত্যকার্য সকল সম্পাদিত হয়, যাহা সকল বাঙ্গালীতে বুঝে, তাহাই বাঙ্গালা ভাষা।
২. 'হে ভ্রাতঃ' বলিয়া যে ডাকে, বোধ হয় যেন সে যাত্রা করিতেছে, 'ভাইরে' বলিয়া যে ডাকে, তাহার ডাকে মন উছলিয়া উঠে।
৩. কথনের উদ্দেশ্য কেবল সামান্য জ্ঞাপন, লিখনের উদ্দেশ্য শিক্ষাদান, চিত্ত সঞ্চালন।
৪. বিষয় অনুসারেই রচনার ভাষার উচ্চতা বা সামান্যতা নির্ধারিত হওয়া উচিত।
৫. যাহা অসুন্দর, মনুষ্যচিত্তের উপরে তাহার শক্তি অল্প।

**৪ নং ব্যাখ্যার নমুনা-উত্তরঃ**

আলোচ্য অংশটুকু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'বাঙ্গালা ভাষা' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে গৃহীত হয়েছে। এখানে প্রবন্ধকার বাংলা ভাষা, বিশেষত বাংলা গদ্য সম্পর্কে নিজের মত ব্যক্ত করেছেন।

প্রাচীনপন্থী সংস্কৃতপ্রিয় পন্ডিতগণ বাংলা গদ্যে আভাঙ্গা অর্থাৎ খাঁটি সংস্কৃত শব্দ ও দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদ আমদানি করার পক্ষে ছিলেন। তাঁরা মনে করতেন যে, যাদের সংস্কৃত ভাষায় দক্ষতা নেই তাদের বাংলা গ্রন্থ প্রণয়নের অধিকার নেই। অন্যদিকে নব্যপন্থী প্যারীচাঁদ মিত্র বা কালীপ্রসন্ন সিংহের গ্রন্থের ভাষা প্রচলিত কথ্যরীতির নির্ভেজাল অনুকৃতি। বঙ্কিমচন্দ্র এই উভয় পথই অগ্রহণযোগ্য মনে করেন। কারণ তাঁর মতে কথন ও লেখনের উদ্দেশ্যের মধ্যে পার্থক্য আছে। তিনি অভিমত প্রদান করেন যে, গ্রন্থের উপজীব্য বিষয়বস্তু যদি গুরুগম্ভীর হয় তবে সে অনুসারে ভাষাও গাম্ভীর্যপূর্ণ হবে, আর বিষয়বস্তু হালকা বা লঘু হলে ভাষা তাকে অনুসরণ করবে। এর উল্টো হলে ভাষা আড়ষ্ট হবে এবং বিষয়ের যথাযথ উপস্থাপনে হবে ব্যর্থ।

**রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর লিখুন**

১. 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা ভাষার নব্যপন্থীদের মতামত সম্বন্ধে কি বলেছেন?
২. বঙ্কিমচন্দ্রের মতে সাহিত্যের ভাষা কিরূপ হওয়া উচিত তা 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধ অনুসরণে লিখুন।
৩. বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাঙ্গালা ভাষা' শীর্ষক প্রবন্ধ হতে বাংলা ভাষার গতি প্রকৃতির পরিচয় দিয়ে আপনার মতে আদর্শ বাংলা কিরূপ হওয়া উচিত এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করুন।
৪. 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধের নামকরণের সার্থকতা যাচাই করুন।
৫. বাংলা ভাষার আদর্শরূপ কি হওয়া উচিত? বঙ্কিমচন্দ্রের মত উলেখ করে প্রশ্নটির যথাযথ উত্তর দিন।

**২ নং রচনামূলক প্রশ্নের নমুনা-উত্তরঃ**

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সমকালে বিদ্যাসাগরের গদ্যরীতির একটি কাঠামো সুনির্দিষ্ট হয়। তাছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালে প্যারীচাঁদের 'আলালি গদ্য ঢঙ' বাংলা সাহিত্যে বেশ প্রভাববিস্তারী হয়ে ওঠে। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রাথমিক অবলম্বন মুখ্যত

বিদ্যাসাগরি রীতি হলেও খুব অল্প সময়ের মধ্যে তিনি একটি স্বতন্ত্র রচনারীতি গড়ে তুলতে সক্ষম হন। 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধে তিনি এ সম্পর্কে মতামত প্রদান করেছেন।

প্রাচীনপন্থীদের প্রতিনিধি হিসেবে রামগতি ন্যায়রত্নের মতামত আলোচনা করে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন যে, গ্রন্থরচনার মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত সহজবোধ্যতা।

অতএব, সাহিত্য এমন ভাষাতে রচিত হওয়া দরকার যাতে অল্পশিক্ষিত পাঠকগণও তা সহজে বুঝতে পারেন এবং অর্থগ্রহণে সমর্থ হন। সাহিত্যে অপ্রয়োজনে কঠিন শব্দ ও সমাসবদ্ধ দীর্ঘ পদবিন্যাস আমদানি করলে ভাষা আড়ষ্ট হয়ে পড়ে।

রামগতি ন্যায়রত্নের মতো যারা ইচ্ছে করে সংস্কৃত শব্দবহুল শব্দে বাংলা রচনায় আগ্রহী তাঁরা অধিকাংশ বাঙালি পাঠকের কথা বিবেচনায় রাখেন না। জ্ঞান যেহেতু মানুষের মৌলিক অধিকার সেহেতু, কঠিন ভাষায় গ্রন্থরচণা করে সাধারণ মানুষকে জ্ঞানের রাজ্য থেকে দূরে রাখার অধিকার লেখকগণ গ্রহণ করতে পারেন না। যারা এ পথ অবলম্বন করেন, বঙ্গিমচন্দ্র তাঁদের খলস্বভাব, পাখন্ড ও বঞ্চক বলে অভিহিত করেন। আর তাঁদের গদ্যকে বলেছেন 'দেড়গজী সমাসপরম্পরা বিন্যাসে' বিন্যস্ত।

বাংলা সাহিত্যে অনুসৃত হওয়ার জন্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালি গদ্য' বা কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোমী গদ্য'-কেও তিনি যথাযথ মনে করেননি। শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বাংলা সহজীকরণ পদ্ধতির যেমন তিনি সমালোচনা করেছেন, তেমনি 'আলালি' বা 'হুতোমি' গদ্যে ভাষার কথ্যরীতির হুবহু রূপকে তিনি মেনে নেননি। কারণ তিনি মনে করেন, 'লিখনের ভাষা এবং কথনের ভাষা চিরকাল স্বতন্ত্র থাকিবে।' শিক্ষাদান সাহিত্য সৃষ্টির উদ্দেশ্য। আলালি বা হুতোমি ভাষা এতোটাই লঘু যে, ঐ ভাষাতে রচিত সাহিত্যে বয়স্যদের সঙ্গে আমোদ চলে কিন্তু পিতা-পুত্র একসঙ্গে পাঠ করতে পারে না। ফলে শিক্ষাদান সম্ভব নয়।

বঙ্কিমচন্দ্র নিজে মনে করেন, 'বিষয় অনুসারেই রচনার ভাষার উচ্চতা বা সামান্যতা নির্ধারিত হওয়া উচিত। রচনার প্রধান গুণ এবং প্রথম প্রযোজন, সরলতা এবং স্পষ্টতা।' এর ব্যত্যয় তিনি পছন্দ করেননি। তাঁর মতে প্রত্যেক পাঠক একবার পঠনের মাধ্যমে যে ভাষার অর্থ অনুধাবন করতে পারে, সে ভাষাই উৎকৃষ্ট ভাষা। আর যদি ওই ভাষাতে সৌন্দর্যের ছোঁয়া লাগে তবে তা হয়ে ওঠে মনোমুগ্ধকর ও হৃদয়গ্রাহী। তিনি ভাষাকে অর্থবহ ও স্পষ্ট করার সঙ্গে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করার ব্যাপারে এ কারণে গুরুত্ব আরোপ করেছেন যে, তিনি মনে করতেন, 'যাহা অসুন্দর, মনুষ্যৎচিত্তের উপরে তাহার শক্তি অল্প।'

প্রকৃতপক্ষে, বঙ্কিমচন্দ্র প্রাচীনপন্থী ও নব্যপন্থী উভয় সম্প্রদায়ের মতামত ত্যাগ করে বাংলা সাহিত্যের গদ্য রচনায় এক মধ্যপন্থা অবলম্বনের কথাই তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধে বলেছেন; যেখানে বিষয় অনুসারে ভাষা ব্যবহার হবে এবং তা অবশ্যই সৌন্দর্যমন্ডিত হয়ে উপস্থাপিত হবে।

**পাঠ-২.১**

# সভ্যতার সংকট

**রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর**
**(১৮৬১-১৯৪১)**

## উদ্দেশ্য

## এই পাঠ শেষে আপনি—

- ইংরেজ শাসনামলে কতিপয় বাঙালি 'ইংরেজদের ঔদার্য ও দাক্ষিণ্যেরল্লারাই ভারতের স্বাধীনতা অর্জন' সম্ভব, — এই মতে বিশ্বাসী হয়েছিলেন কেন তা প্রকাশ করতে পারবেন।
- তরুণ বয়সে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং কিভাবে ইংরেজদের হৃদয়ের ব্যাপ্তি ও জাতিগত অসংকীর্ণতায় মোহাবিষ্ট হয়েছিল তা ব্যক্ত করতে পারবেন।
- ইংরেজদের বিশ্বকর্তৃত্ব অর্জনের কারণটি চিহ্নিত করতে পারবেন।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কায় মানবসভতার উদ্বেগের স্বরূপ রবীন্দ্রমানসকে কীভাবে আলোড়িত করেছে তা লিখতে পারবেন।

## ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শেষ প্রবন্ধ রচনা 'সভ্যতার সংকট'। এখানে প্রবন্ধকার নিজের গোটা জীবন-পরিসরের উপর আলোক প্রক্ষেপণ করে পাশ্চাত্য সভ্যতার সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র তুলে ধরেছেন। জীবনের অন্তিমকালে এসে প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথ এমন মত ব্যক্ত করেছেন, যেখানে পাশ্চাত্য সভ্যতার বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশিত, প্রতীচ্য সভ্যতায় আস্থা পুনর্ঘোষিত। তবে মানুষের উপরই তার অন্তিম নির্ভরতা স্থাপন। কারণ, তিনি মনে করেন, 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ'।

## লেখক পরিচিতি

আপনারা ইতোপূর্বে ইউনিট-২-এর **বলাকা** শীর্ষক পাঠে রবীন্দ্রনাথের জীবন ও তাঁর সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে জেনেছেন। রবীন্দ্র-জীবনী সম্বন্ধে আরো বিস্তারিত জানতে চাইলে কবির স্বপ্রণীত-জীবনীগ্রন্থ **'আমার ছেলেবেলা'** ও **'জীবনস্মৃতি'** নামক গ্রন্থ দুটি পাঠ করতে পারেন।

## পাঠ পরিচিতি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধটি রচনা করেছেন **১৩৪৮** বঙ্গাব্দের পহেলা বৈশাখ। ওই বছরই তাঁর একাশিতম জন্মদিনে প্রবন্ধটি পঠিত হয়। রবীন্দ্র — জীবনীকারদের ভাষ্য মতে, এটিই তাঁর রচিত সর্বশেষ প্রবন্ধ। পরে **'কালান্তর'** গ্রন্থে প্রবন্ধটি স্থান পায়। সর্বমোট দশটি অনুচ্ছেদে বিভক্ত এই প্রবন্ধের শব্দসংখ্যা প্রায় আঠারো শত। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পাশ্চাত্য, বিশেষ করে ইংরেজদের লালিত ও প্রচারিত সভ্যতার অন্তঃসারশূন্যতার কথা তুলে ধরে প্রাচ্যের নিজস্ব কৃষ্টির উপর আস্থা প্রকাশ করেছেন। জীবনের প্রান্তিকে রচিত বর্তমান প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন যে, এ সিদ্ধান্ত তাঁর জীবনোপলব্ধিজাত।

'সভ্যতার সংকটে'র সূচনায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, তাঁর আশি বছর পূর্ণ হয়েছে। এ দীর্ঘ সময়ে তাঁর জীবনের ও দেশের মনোবৃত্তির পরিণতি দ্বিখন্ডিত হয়ে গেছে। এতে দুঃখবোধের কারণ আছে। প্রবন্ধকার বলেছেন, তাঁর দেশ বা উপমহাদেশে জ্ঞান, বিজ্ঞান, সাহিত্য ইত্যাদিতে যে ব্যাপক অগ্রসরতার সূচনা হয়েছিলো তা মূলত ইংরেজদের কল্যাণে। আর এ জন্যে ওই সময় বাঙালিরা বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলো যে, ইংরেজদের ঔদার্য ও দাক্ষিণ্যেই বুঝি ভারতের স্বাধীনতা অর্জিত হবে। অবশ্য তখনো ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদী চরিত্রের প্রকাশ ঘটেনি। রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত-স্মৃতি রোমন্থন করে বলেছেন, তরুণ বয়সে ইংল্যান্ড গমন করে তাদের সম্পর্কে জেনে, বিশেষ করে পার্লামেন্টারিয়ান জন ব্রাইটের বক্তব্য শুনে তিনি ইংরেজদের হৃদয়ের ব্যাপ্তি ও জাতিগত অসংকীর্ণতা আবিষ্কার করে মোহাবিষ্ট হন। ইংরেজি সাহিত্য অধ্যয়নও তাঁকে জ্ঞানসম্পদবান করে তোলে। প্রবন্ধকার এখানে 'সভ্যতা' বলতে ইংরেজি 'সিভিলিজেশন'-এর অযথার্থ বঙ্গানুবাদের কথা উলেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, তাঁর শৈশবে শিক্ষিত সমাজে বাহ্য-আচরণ বিরোধী একটা মনোভাব প্রবল হয়ে

ওঠে। এতে ইংরেজদের উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত করা হয়। রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক পরিএন্ডলেও এর প্রভাব পড়ে। অথচ, প্রাচীন ভারতে এই 'সভ্যতা'-কেই বলা হতো 'সদাচার'।

প্রবন্ধের পঞ্চম অনুচ্ছেদ থেকে ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের বোধজগতে কালক্রমে যে পরিবর্তন সংঘটিত হয় তার উলেখ আছে। নিরন্ন, হীনস্বাস্থ্য ভারতবাসীকে শাসক ইংরেজদের শোষণ ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করে তিনি ব্যথিত হন। আবিষ্কার করেন, ইংরেজগণ বিশ্বজুড়ে যে আধিপত্য বিস্তার করেছে তা নৈতিক শক্তিরদ্বারা নয়, যন্ত্রশক্তি দিয়ে। রবীন্দ্রনাথ এখানে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইংল্যান্ডের তুলনা করে বলেছেন যে, বহুজাতিক সোভিয়েত ইউনিয়ন যেখানে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ব্যক্তির মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করেছে ইংল্যান্ড তা করেনি। বরং ভারতে বহুজাতি ও ধর্মের মধ্যে বিদ্বেষ ও সন্দেহ সৃষ্টি করে দেশ শাসন করছে। তিনি ইংরেজদের ঔপনিবেশিক নীতির সমালোচনায় কঠোর হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছেন যে, একদিন ভারতবর্ষ ত্যাগ করে ইংরেজরা যেতে বাধ্য হবে। তবে তখন হয়তো তারা ভারতকে শোষণ-বঞ্চনায় নি:স্ব করে ফেলবে। জীবনের প্রথম দিকে ইউরোপের অন্তরের সম্পদ সম্পর্কে তাঁর যে উচ্চধারণা ছিলো এখানে তা তিনি পরিত্যাগ করেছেন। এ অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ শেষবারের মতো মানুষের কাছেই ফিরে গেছেন, তাদের প্রতি বিশ্বাস পুনর্ব্যক্ত করেছেন। তবে সে মানুষ আর ইংল্যান্ড বা পাশ্চাত্যবাসী নয়, সে মানুষের বাস 'পূর্ব দিগন্তে' অর্থাৎ তারা প্রাচ্যের অধিবাসী।

# মূলপাঠ

আজ আমার বয়স আশি বৎসর পূর্ণ হল, আমার জীবনক্ষেত্রের বিস্তীর্ণতা আজ আমার সম্মুখে প্রসারিত। পূর্বতম দিগন্তে যে জীবন আরম্ভ হয়েছিল তার দৃশ্য অপর প্রান্ত থেকে নি:সক্ত দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি এবং অনুভব করতে পারছি যে, আমার জীবনের এবং সমস্ত দেশের মনোবৃত্তির পরিণতি দ্বিখন্ডিত হয়ে গেছে — সেই বিচ্ছিন্নতার মধ্যে গভীর দু:খের কারণ আছে।

বৃহৎ মানববিশ্বের সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় আরম্ভ হয়েছে সেদিনকার ইংরেজ জাতির ইতিহাসে। আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে উদ্‌ঘাটিত হল একটি মহৎ সাহিত্যের উচ্চশিখর থেকে ভারতের এই আগন্তুকের চরিত্রপরিচয়। তখন আমাদের বিদ্যালাভের পথ্য-পরিবেশনে প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য ছিল না। এখনকার যে বিদ্যা জ্ঞানের নানা কেন্দ্র থেকে বিশ্বপ্রকৃতির পরিচয় ও তার শক্তির রহস্য নতুন নতুন করে দেখাচ্ছে তার অধিকাংশ ছিল তখন নেপথ্যে, অগোচরে। প্রকৃতিতত্ত্বে বিশেষজ্ঞদের সংখ্যা ছিল অল্পই। তখন ইংরেজি ভাষার ভিতর দিয়ে ইংরেজি সাহিত্যকে জানা ও উপভোগ করা ছিল মার্জিতমনা বৈদগ্ধ্যের পরিচয়। দিনরাত্রি মুখরিত ছিল বার্কের বাগ্মিতায়, মেকলের ভাষাপ্রবাহের তরঙ্গ-ভঙ্গে; নিয়তই আলোচনা চলত শেক্‌স্‌পিয়ারের নাটক নিয়ে, বায়রনের কাব্য নিয়ে এবং তখনকার পলিটিক্‌সে সর্বমানবের বিজয়ঘোষণায়। তখন আমরা স্বজাতির স্বাধীনতার সাধনা আরম্ভ করেছিলুম, কিন্তু অন্তরে ছিল ইংরেজ জাতির ঔদার্যের প্রতি বিশ্বাস। সেই বিশ্বাস এত গভীর ছিল যে এক সময় আমাদের সাধকেরা স্থির করেছিলেন যে, এই বিজিত জাতির স্বাধীনতার পথ বিজয়ী জাতির দাক্ষিণ্যেরদ্বারাই প্রশস্ত হবে। কেননা এক সময় অত্যাচার-প্রপীড়িত জাতির আশ্রয়স্থল ছিল ইংলন্ডে। যারা স্বজাতির সম্মান রক্ষার জন্য প্রাণপণ করছিল তাদের অকুণ্ঠিত আসন ছিল ইংলন্ডে। মানবমৈত্রীর বিশুদ্ধ পরিচয় দেখেছি ইংরেজ-চরিত্রে। তাই আন্তরিক শ্রদ্ধা নিয়ে ইংরেজকে হৃদয়ের উচ্চাসনে বসিয়েছিলেম। তখনো সাম্রাজ্যমদমত্ততায় তাদের স্বভাবের দাক্ষিণ্য কলুষিত হয়নি।

আমার যখন বয়স অল্প ছিল ইংলন্ডে গিয়েছিলেম। সেই সময় জন্ ব্রাইটের মুখ থেকে পার্লামেন্টে এবং তার বাহিরে কোনো কোনো সভায় যে বক্তৃতা শুনেছিলেম তাতে শুনেছি চিরকালের ইংরেজের বাণী। সেই বক্তৃতায় হৃদয়ের ব্যাপ্তি জাতিগত সকল সংকীর্ণ সীমাকে অতিক্রম করে যে প্রভাব বিস্তার করেছিল সে আমার আজ পর্যন্ত মনে আছে এবং আজকের এই শ্রীভ্রষ্ট দিনেও আমার পূর্বস্মৃতিকে রক্ষা করছে। এই পরনির্ভরতা নিশ্চয়ই আমাদের শাঘার বিষয় ছিল না। কিন্তু এর মধ্যে এইটুকু প্রশংসার বিষয় ছিল যে, আমাদের আবহমান কালের অনভিজ্ঞতার মধ্যেও মনুষ্যত্বের যে-একটি মহৎ রূপ সেদিন দেখেছি তা বিদেশীয়কে আশ্রয় করে প্রকাশ পেলেও, তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করবার শক্তি আমাদের ছিল ও কুণ্ঠা আমাদের মধ্যে ছিল না। কারণ, মানুষের মধ্যে যা-কিছু শ্রেষ্ঠ তা সংকীর্ণভাবে কোনো জাতির মধ্যে বদ্ধ হতে পারে না, তা কৃপণের অবরুদ্ধ ভান্ডারের সম্পদ নয়। তাই, ইংরেজের যে সাহিত্যে আমাদের মন পুষ্টিলাভ করেছিল আজ পর্যন্ত তার বিজয়শূখ আমার মনে মন্দ্রিত হয়েছে।

সিভিলিজেশন, যাকে আমরা সভ্যতা নাম দিয়ে তর্জমা করেছি, তার যথার্থ প্রতিশব্দ আমাদের ভাষায় পাওয়া সহজ নয়। এই সভ্যতার যে রূপ আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল মনু তাকে বলেছেন সদাচার। অর্থাৎ, তা কতকগুলি সামাজিক নিয়মের বন্ধন। সেই নিয়মগুলির সম্বন্ধে প্রাচীন কালে যে ধারণা ছিল সেও একটি সংকীর্ণ ভূগোলখন্ডের মধ্যে বদ্ধ। সরস্বতী ও দৃশদ্বতী নদীর মধ্যবর্তী যে দেশ ব্রহ্মাবর্ত নামে বিখ্যাত ছিল সেই দেশে যে আচার পারম্পর্যক্রমে চলে এসেছে

তাকেই বলে সদাচার। অর্থাৎ এই আচারের ভিত্তি প্রথার উপরেই প্রতিষ্ঠিত — তার মধ্যে যত নিষ্ঠুরতা, যত অবিচারই থাক্। এই কারণে প্রচলিত সংস্কার আমাদের আচার-ব্যবহারকেই প্রাধান্য দিয়ে চিত্তের স্বাধীনতা নির্বিচারে অপহরণ করেছিল। সদাচারের যে আদর্শ একদা মনু ব্রহ্মাবর্তে প্রতিষ্ঠিত দেখেছিলেন সেই আদর্শ ক্রমশ লোকাচারকে আশ্রয় করলে। আমি যখন জীবন আরম্ভ করেছিলুম তখন ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে এই বাহ্য আচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেশের শিক্ষিত মনে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। রাজনারায়ণবাবু-কর্তৃক বর্ণিত তখনকার কালের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ব্যবহারের বিবরণ পড়লে সে কথা স্পষ্ট বোঝা যাবে। এই সদাচারের স্থলে সভ্যতার আদর্শকে আমরা ইংরেজ জাতির চরিত্রের সঙ্গে মিলিত করে গ্রহণ করেছিলেম। আমাদের পরিবারে এই পরিবর্তন, কী ধর্মমতে, কী লোকব্যবহারে, ন্যায়বুদ্ধির অনুশাসনে পূর্ণভাবে গৃহীত হয়েছিল। আমি সেই ভাবের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলুম এবং সেই সঙ্গে আমাদের স্বাভাবিক সাহিত্যানুরাগ ইংরেজকে উচ্চাসনে বসিয়েছিল। এই গেল জীবনের প্রথম ভাগ — তার পর থেকে ছেদ আরম্ভ হল কঠিন দুঃখে। প্রত্যহ দেখতে পেলুম, সভ্যতাকে যারা চরিত্র-উৎস থেকে উৎসারিত রূপে স্বীকার করেছে, রিপুর প্রবর্তনায় তারা তাকে কী অনায়াসে লঙ্ঘন করতে পারে।

নিভৃতে সাহিত্যের রসসম্ভোগের উপকরণের বেষ্টন হতে একদিন আমাকে বেরিয়ে আসতে হয়েছিল। সেদিন ভারতবর্ষের জনসাধারণের যে নিদারুণ দারিদ্র্য আমার সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হল তা হৃদয়বিদারক। অন্ন বস্ত্র পানীয় শিক্ষা আরোগ্য প্রভৃতি মানুষের শরীর মনের পক্ষে যা-কিছু অত্যাবশ্যক তার এমন নিরতিশয় অভাব বোধ হয় পৃথিবীর আধুনিক শাসন-চালিত কোনো দেশেই ঘটেনি। অথচ এই দেশ ইংরেজকে দীর্ঘকাল ধরে তার ঐশ্বর্য জুগিয়ে এসেছে। যখন সভ্য জগতের মহিমাধ্যানে একান্তমনে নিবিষ্ট ছিলেম তখন কোনোদিন সভ্যনামধারী মানব আদর্শের এত বড়ো নিষ্ঠুর বিকৃত রূপ কল্পনা করতেই পারিনি; অবশেষে দেখছি, একদিন এই বিকারের ভিতর দিয়ে বহুকোটি জনসাধারণের প্রতি সভ্যজাতির অপরিসীম অবজ্ঞাপূর্ণ ঔদাসীন্য।

যে যন্ত্রশক্তির সাহায্যে ইংরেজ আপনার বিশ্বকর্তৃত্ব রক্ষা করে এসেছে তার যথোচিত চর্চা থেকে এই নিঃসহায় দেশ বঞ্চিত। অথচ চক্ষের সামনে দেখলুম, জাপান যন্ত্রচালনার যোগে দেখতে দেখতে সর্বোতভাবে কী রকম সম্পদবান হয়ে উঠল। সেই জাপানের সমৃদ্ধি আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছি, দেখেছি সেখানে স্বজাতির মধ্যে তার সভ্যশাসনের রূপ। আর দেখেছি রাশিয়ার মস্কাও নগরীতে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের আরোগ্যবিস্তারের কী অসামান্য অকৃপণ অধ্যবসায়— সেই অধ্যবসায়ের প্রভাবে এই বৃহৎ সাম্রাজ্যের মূর্খতা ও দৈন্য ও আত্মাবমাননা অপসারিত হয়ে যাচ্ছে। এই সভ্যতা জাতিবিচার করেনি, বিশুদ্ধ মানব সম্বন্ধের প্রভাব সর্বত্র বিস্তার করেছে। তার দ্রুত এবং আশ্চর্য পরিণতি দেখে একই কালে ঈর্ষা এবং আনন্দ অনুভব করেছি। মস্কাও শহরে গিয়ে রাশিয়ার শাসনকার্যের একটি অসাধারণতা আমার অন্তরকে স্পর্শ করেছিল— দেখেছিলেম, সেখানকার মুসলমানদের সঙ্গে রাষ্ট্র-অধিকারের ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে অমুসলমানদের কোনো বিরোধ ঘটে না, তাদের উভয়ের মিলিত স্বার্থসম্বন্ধের ভিতরে রয়েছে শাসনব্যবস্থার যথার্থ সত্য ভূমিকা। বহুসংখ্যক পরজাতির উপর প্রভাব চালনা করে এমন রাষ্ট্রশক্তি আজ প্রধানত দুটি জাতির হাতে আছে — এক ইংরেজ, আর-এক সোভিয়েট রাশিয়া। ইংরেজ এই পরজাতীয়ের পৌরুষ দলিত করে দিয়ে তাকে চিরকালের মতো নির্জীব করে রেখেছে। সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে রাষ্ট্রিক সম্বন্ধ আছে বহুসংখ্যক মরুচর মুসলমান জাতির — আমি নিজে সাক্ষ্য দিতে পারি, এই জাতিকে সকল দিকে শক্তিমান করে তোলবার জন্য তাদের অধ্যবসায় নিরন্তর। সকল বিষয়ে তাদের সহযোগী করে রাখবার জন্য সোভিয়েট গভর্নমেন্টের চেষ্টার প্রমাণ আমি দেখেছি এবং সে সম্বন্ধে কিছু পড়েছি। এই রকম গভর্নমেন্টের প্রভাব কোনো অংশে অসম্মানকর নয় এবং তাতে মনুষ্যত্বের হানি করে না। সেখানকার শাসন বিদেশীয় শক্তির নিদারুণ নিষ্পেষণী যন্ত্রের শাসন নয়। দেখে এসেছি, পারস্যদেশ একদিন দুই য়ুরোপীয় জাতির জাঁতার চাপে যখন পিষ্ট হচ্ছিল তখন সেই নির্মম আক্রমণের য়ুরোপীয় দংষ্ট্রাঘাত থেকে আপনাকে মুক্ত করে কেমন করে এই নবজাগ্রত জাতি আত্মশক্তির পূর্ণতাসাধনে প্রবৃত্ত হয়েছে। দেখে এলেম, জরথুস্ট্রিয়ান্‌দের সঙ্গে মুসলমানদের এক কালে যে সাংঘাতিক প্রতিযোগিতা ছিল বর্তমান সভ্যশাসনে তার সম্পূর্ণ উপশম হয়ে গিয়েছে। তার সৌভাগ্যের প্রধান কারণ এই যে, সে য়ুরোপীয় জাতির চক্রান্তজাল থেকে মুক্ত হতে পেরেছিল। সর্বান্তঃকরণে আজ আমি এই পারস্যের কল্যাণকামনা করি। আমাদের প্রতিবেশী আফগানিস্থানের মধ্যে শিক্ষা এবং সমাজনীতির সেই সার্বজনীন উৎকর্ষ যচি এখনো ঘটেনি, কিন্তু তার সম্ভাবনা অক্ষুণ্ন রয়েছে, তার একমাত্র কারণ — সভ্যতাগর্বিত কোনো য়ুরোপীয় জাতি তাকে আজও অভিভূত করতে পারেনি। এরা দেখতে দেখতে চার দিকে উন্নতির পথে, মুক্তির পথে, অগ্রসর হতে চলল।

◆ ◆

## শব্দার্থ ও টীকা

**বার্ক—** জন্ম ১৭২৯, মৃত্যু ১৭৯৭ খ্রিষ্টাব্দে। আইরিশ দার্শনিক ও বাগ্মী বার্ক এডমন্ড ছিলেন মূলত মানবতাবাদী আদর্শে বিশ্বাসী। 'A Philosophyical Inquiry into the Sublime and Beautiful' তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ।

**মেকলে—** জন্ম ১৮০০, মৃত্যু ১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দে। টমাস ব্যারিংটন মেকলে একজন খ্যাতি সম্পন্ন ঐতিহাসিক ছিলেন। ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টের সদস্যও ছিলেন তিনি। তিনি ভারতীয় শিক্ষাপরিকল্পনা ও চিন্তাকে তাঁর মতবাদ দিয়ে প্রভাবিত করেন ব্যাপকভাবে। 'Macaulay's History of England' তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ।

**শেক্স্পিয়র—** উইলিয়াম শেক্স্পিয়রের জন্ম ১৫৬৪, মৃত্যু ১৬১৬ খ্রিস্টাব্দে। তিনি ইংল্যান্ডের মহাপ্রতিভাশালী কবি ও নাট্যকার। বিশ্বসাহিত্যে অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। কিং লিয়ার, মার্চেন্ট অব্ ভেনিস, ম্যাকবেথ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ।

**বায়রন—** ইংরেজ কবিদের মধ্যে অগ্রগণ্য। তাঁর কাব্যে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধ ও স্বাধীনতাস্পৃহা প্রবল। 'Child Harold's Pilgrimage' তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ।

**সাম্রাজ্যমদমত্ততা—** সাম্রাজ্য লাভ করার উগ্রতা। এই নীতিকে বলা হয় সাম্রাজ্যবাদীনীতি। সাধারণত শক্তিশালী রাষ্ট্র যখন সাম্রাজ্যের বিস্তার করে, তখন সেই বিস্তারকে এবং তার সাম্রজ্য-বিস্তারের আকাঙ্ক্ষাকেই সাম্রাজ্যমদমত্ততা বলে। রাশিয়ার ভ.ই. লেনিন ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর 'Imperialism, The Highest Stage of Capitalism' গ্রন্থে সাম্রাজ্যবাদের সুনিপুণ ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

**জন্ ব্রাইট—** ব্রিটিশ পার্লামেন্টের তৎকালীন সদস্য।

**শ্রীভ্রষ্ট—** সৌন্দর্যহানি বা সৌন্দর্য-বিচ্যুতি।

**সিভিলিজেশন—** ইংরেজি শব্দ Civilization-এর বাংলা প্রতিশব্দ 'সভ্যতা'। বর্বর জীবন থেকে উন্নত হওয়া; মার্জিত রুচিবোধে পরিশীলিত হওয়া।

**মুন—** পৌরাণিক মনু ব্রহ্মারপুত্র; মানবজাতির আদিপুরুষ। মনু ১৪ জন। মানবের এই ১৪ জন জন্মদাতা এক-এক মতান্তরের অধিপতি। মনুগণ প্রত্যেকেই ধর্মশাস্ত্রপ্রণেতা।

**সরস্বতী ও দৃশদ্বতী—** হিন্দু পুরাণে বর্ণিত দুই নদী।

**ব্রহ্মাবর্ত—** মহাভারত অনুসারে কুরুক্ষেত্রের নিকটে এবং সরস্বতী ও দৃশদ্বতী নদীর মধ্যে অবস্থিত প্রাচীন দেশ।

**রাজনারায়ণবাবু—** প্রকৃতনাম রাজনারায়ণ বসু। তিনি রবীন্দ্রনাথের গৃহশিক্ষক ছিলেন। তবে তাঁর বড় পরিচয় একজন জাতীয়তাবাদী ও উনিশ শতকের শিক্ষা-সংস্কৃতি বিকাশের আন্দোলনের নেতা হিসেবে বেশি। তিনি হিন্দুমেলার উদ্বোধক ছিলেন। রচিত গ্রন্থের মধ্যে 'আত্মচরিত', 'সায়েন্স অব রিলিজিয়ন', 'সেকাল আর একাল' উল্লেখযোগ্য।

## বস্তুসংক্ষেপ

আশি বছর অতিক্রান্ত রবীন্দ্রনাথ তাঁর সুদীর্ঘ জীবন পরিসরের অর্জিত অভিজ্ঞতা ও বোধ প্রকাশ করেছেন 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে। এই সুদীর্ঘ সময়ে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের অনুভব আর মনোবৃত্তিগত খন্ডতায় তিনি দুঃখিত হয়েছেন। বাঙালি তথা ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষ মানব বিশ্বের বৃহত্তর আঙ্গিনার সঙ্গে পরিচিত হয় ইংরেজদের কল্যাণে। বার্ক, মেকলে, শেকস্পীয়র, বায়রন প্রমুখের রচনা ও চিন্তার সঙ্গে পরিচিত হয়ে এদেশীয় মানুষ প্রভূত লাভবান হয়। ইতোপূর্বে জ্ঞানার্জনের বিচিত্রপথ কিংবা বিজ্ঞানের রহস্য ভারতবাসীর অজানাই ছিলো । বাঙালিদের একটা অংশ তখন বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন ইংরেজদের জ্ঞানস্পৃহা ও ঔদার্যে। তাঁরা মনে করতেন ভারতের স্বাধীনতাও ইংরেজ-দাক্ষিণ্যেই সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ নিজেও বাল্যকালে ইংল্যান্ডে গিয়েছেন এবং ব্যাপক পরিমাণে ইংরেজি গ্রন্থ পাঠ করেছেন। এসব ছাড়াও ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টে রাজনীতিকদের বক্তব্য শুনে রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে ইংরেজদের হৃদয়ের ব্যাপ্তি ও জাতিগত অসংকীর্ণ চিন্তায় মোহাবিষ্ট হন। তাঁর শৈশব কালে বাঙালি শিক্ষিত সমাজে ইংরেজ-অনুসৃত সভ্যতার চর্চা হিসেবে প্রথাগত আচার-বিরোধিতা দেখা দেয়। এতেও ইংরেজদের প্রতি শ্রদ্ধা ছিলো প্রকাশমান। রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক অবস্থান ছিলো এই নতুন মূল্যবোধের অনুকূলে। এসবের প্রভাব ও সাহিত্যানুরাগের ফলে ইংরেজদের উচ্চাসন দান করা হয়েছিল।

কিন্তু সাহিত্যের কল্পনারাজ্যের বাইরে রবীন্দ্রনাথ যখন তাকালেন বাস্তবে, দেশের জনসাধারণের দিকে, তাঁর তখনই ইংরেজদের প্রতি মোহ ভঙ্গ হতে শুরু করে। মানুষকে অন্ন-বস্ত্র-স্বাস্থ্যহীন রেখে ইংরেজরা ভারতবর্ষকে শাসনের নামে যে কেবল শোষণই করছে এই সত্য সেসময় তিনি অনুধাবন করতে পারেন। রবীন্দ্রনাথ লক্ষ করেন যে, ইংরেজরা দেশ শাসন করার নৈতিক শক্তি হারিয়ে ফেলেছে, এখন যন্ত্র শক্তি দিয়ে কেবল শোষণ করছে। বহুজাতিক রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়ন যেখানে জাত, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে মনুষ্যত্বকে গুরুত্ব দিয়ে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও উন্নতির নজির স্থাপন করেছে, ইংরেজরা সেখানে অন্যের সংস্কৃতির উপর আগ্রাসন, সাম্প্রদায়িক অসম্প্রীতি জিইয়ে রেখে দেশ শাসন করছে। পারস্য, আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশেও সহাবস্থানের অনন্য নজির স্থাপিত।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন

**সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের উত্তর লিখুন**

১. ইংরেজ শাসনামলে কতিপয় বাঙালি ইংরেজদের ঔদার্য ও দাক্ষিণ্যেরস্নারাই ভারতের স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব — এই মতে কেন বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন?

২. রবীন্দ্রনাথের তরুণ বয়সে বাঙালি শিক্ষিত সমাজের একটা অংশ কি কারণে ইংরেজদের উপর আস্থাশীল হয়ে উঠেছিলো?

৩. রবীন্দ্রনাথ বর্ণিত ইংরেজদের বিশ্বকর্তৃত্ব অর্জনের কারণটি চিহ্নিত করুন।

৪. বহুজাতিক রাষ্ট্র শাসনের ক্ষেত্রে ইংল্যান্ড ও সোভিয়েত ইউনিয়নের শাসকদের পার্থক্য কোথায়?

**২ নং সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের নমুনা-উত্তরঃ**

ভারতের শাসনভার ইংরেজরা গ্রহণ করার কারণে এই দেশবাসীর সঙ্গে ইংরেজদের শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জাতিগত সম্প্রসারণের প্রত্যক্ষ সংযোগ ঘটে। ইতোপূর্বে জ্ঞানার্জনের বিচিত্র পন্থা এদেশের লোকের অজ্ঞাত হয়। প্রকৃতির রহস্যজানা বিজ্ঞানীর সংখ্যাও ছিলো না। বার্ক, মেকলে, শেকস্পীয়র, বায়রন প্রমুখের রচনা ও ইংরেজদের রাজনৈতিক ঔদার্যের সঙ্গে এ সময় বাঙালি শিক্ষিত সমাজের পরিচয় ঘটে। সর্ব মানবের বিজয় ঘোষণার রাজনৈতিক ঐতিহ্য ইংরেজদের কাছ থেকে পাওয়া সম্ভব হয়। এ-সব কারণে এক সময় বাঙালি শিক্ষিত সমাজের একটা অংশ ইংরেজদের উপর আস্থাশীল হয়ে ওঠে। তারা এমনও ভাবতে থাকে যে, ভারতের স্বাধীনতাও ইংরেজদের ঔদার্য ও দাক্ষিণ্যেরস্নারাই অর্জিত হবে। রবীন্দ্রনাথ তখন বয়সে তরুণ। তিনি ওই বয়সেই ইংল্যান্ড গমন করেন এবং ইংরেজদের শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও নীতিবোধের সঙ্গে পরিচিত হন। সে সময় তিনিও ইংরেজদের প্রতি মোহাবিষ্ট হয়েছিলেন।

**প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ব্যাখ্যা লিখুন**

১. তখন আমরা স্বজাতির স্বাধীনতার সাধনা আরম্ভ করেছিলুম, কিন্তু অন্তরে অন্তরে ছিল ইংরেজ জাতির ঔদার্যের প্রতি বিশ্বাস।

২. অবশেষে দেখেছি, একদিন এই বিকারের ভিতর দিয়ে বহুকোটি জনসাধারণের প্রতি সভ্যজাতির অপরিসীম অবজ্ঞাপূর্ণ ঔদাসীন্য।

৩. এই সভ্যতা জাত বিচার করেনি, বিশুদ্ধ মানব সম্বন্ধের প্রভাব সর্বত্র বিস্তার করেছে।

৪. এই রকম গভর্ন্‌মেন্টের প্রভাব কোনো অংশে অসম্মানকর নয় এবং তাতে মনুষ্যত্বের হানি করে না।

**২ নং ব্যাখ্যার নমুনা-উত্তরঃ**

ব্যাখ্যেয় অংশটুকু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত সর্বশেষ প্রবন্ধ 'সভ্যতার সংকট' থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে। বাস্তব থেকে অর্জিত ব্যক্তি-অভিজ্ঞতা প্রাবন্ধিকের মনোজগতে যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিলো — এখানে তা-ই ব্যক্ত।

ইংরেজদের আগমন ও শাসন পরিচালনার কারণে ভারতে আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তার ক্রমপ্রসার ঘটে। বিদেশী সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে উন্নত জীবনবোধের পরিচয়ও এ সময় ভারতীয়রা লাভ করে। ইংরেজ কথিত 'সিভিলিজেশন' অনুসরণের নামে এদেশীয় শিক্ষিতদের জীবনাচরণেও পরিবর্তন ঘটতে থাকে এবং ইংরেজরা পূজনীয় হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের মনেও ইংরেজদের সম্পর্কে বাল্যকালে একটা মোহ জন্মে। কারণ ওই সময় তিনি ইংল্যান্ড গমন করেন, তাছাড়া ঠাকুরবাড়ির পারিবারিক পরিবেশও তাঁকে প্রভাবিত করে। কিন্তু যৌবনে রবীন্দ্রনাথ কল্পনার সাহিত্য পরিত্যাগ করে যখন বাস্তবধর্মী সৃষ্টিতে মন দেন তখন তাঁর মোহভঙ্গ হতে থাকে। জমিদারির কাজে গিয়ে পলীগ্রামের সাধারণ মানুষের জীবনযাপন প্রত্যক্ষ করার পর তিনি অনুভব করেন শাসক ইংরেজদের সভ্যতা বা মানবতার বুলির আড়ালে মানুষ শোষণের কুচিন্তা ক্রিয়াশীল। উলিখিত বাক্যে সভ্যতাদর্পী ইংরেজদের এই হীন মানসিকতার স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে।

**পাঠ-২.২**

## উদ্দেশ্য

## এই পাঠ শেষে আপনি —

- ইংরেজদের শাসনের প্রতি রবীন্দ্রনাথের শৈশবে গড়ে ওঠা শ্রদ্ধাবোধ তাঁর শেষ জীবনে কোন্ কারণে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে তা উল্লেখ করতে পারবেন।
- ইংরেজদের ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার পরিণতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যে ভবিষ্যদ্বাণী করেন তা বিবৃত করতে পারবেন।
- জীবনের প্রান্তিকে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিশ্বাসকে শেষ পর্যন্ত কোথায় স্থাপিত করেছিলেন, তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

# মূলপাঠ

ভারতবর্ষ ইংরেজের সভ্যশাসনের জগদ্দল পাথর বুকে নিয়ে তলিয়ে পড়ে রইল নিরুপায় নিশ্চলতার মধ্যে। চৈনিকদের মতন এত বড়ো প্রাচীন সভ্য জাতিকে ইংরেজ স্বজাতির স্বার্থসাধনের জন্য বলপূর্বক অহিফেনবিষে জর্জরিত করে দিলে এবং তার পরিবর্তে চীনের এক অংশ আত্মসাৎ করলে। এই অতীতের কথা যখন ক্রমশ ভুলে এসেছি তখন দেখলুম, উত্তর-চীনকে জাপান গলাধঃকরণ করতে প্রবৃত্ত; ইংলন্ডের রাষ্ট্রনীতিপ্রবীণেরা কী অবজ্ঞাপূর্ণ ঔদ্ধত্যের সঙ্গে সেই দস্যুবৃত্তিকে তুচ্ছ বলে গণ্য করেছিল! পরে এক সময় স্পেনের প্রজাতন্ত্র-গভর্নমেন্টের তলায় ইংলন্ড কী রকম কৌশলে ছিদ্র করে দিলে, তাও দেখলাম এই দূর থেকে। সেই সময়েই এও দেখেছি, এক দল ইংরেজ সেই বিপদ্‌গ্রস্ত স্পেনের জন্য আত্মসমর্পণ করেছিলেন। যদিও ইংরেজের এই ঔদার্য প্রাচ্য চীনের সংকটে যথোচিত জাগ্রত হয়নি, তবু য়ুরোপীয় জাতির প্রজাস্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য যখন তাদের কোনো বীরকে প্রাণপাত করতে দেখলুম তখন আবার একবার মনে পড়ল, ইংরেজকে একদা মানব হিতৈষীরূপে দেখেছি এবং কী বিশ্বাসের সঙ্গে ভক্তি করেছি। য়ুরোপীয় জাতির স্বভাবগত সভ্যতার প্রতি বিশ্বাস ক্রমে কী করে হারানো গেল তারই এই শোচনীয় ইতিহাস আজ আমাকে জানাতে হল। সভ্যশাসনের চালনায় ভারতবর্ষের সকলের চেয়ে যে দুর্গতি আজ মাথা তুলে উঠেছে সে কেবল অন্ন বস্ত্র শিক্ষা এবং আরোগ্যের শোকাবহ অভাব মাত্র নয়; সে হচ্ছে ভারতবাসীর মধ্যে অতি নৃশংস আত্মবিচ্ছেদ, যার কোনো তুলনা দেখতে পাইনি ভারতবর্ষের বাইরে মুসলমান স্বায়ত্ত-শাসনচালিত দেশে। আমাদের বিপদ এই যে, এই দুর্গতির জন্যে আমাদেরই সমাজকে একমাত্র দায়ী করা হবে। কিন্তু এই দুর্গতির রূপ যে প্রত্যহই ক্রমশ উৎকট হয়ে উঠেছে, সে যদি ভারতশাসনযন্ত্রের ঊর্ধ্বস্তরে কোনো-এক গোপন কেন্দ্রে প্রশ্রয়েরস্নারা পোষিত না হত তা হলে কখনোই ভারত-ইতিহাসের এত বড়ো অপমানকর অসভ্য পরিণাম ঘটতে পারত না। ভারতবাসী যে বুদ্ধিসামর্থ্যে কোনো অংশে জাপানের চেয়ে ন্যূন, এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। এই দুই প্রাচ্যদেশের সর্বপ্রধান প্রভেদ এই — ইংরেজশাসনেরস্নারা সর্বতোভাবে অধিকৃত ও অভিভূত ভারত, আর জাপান এইরূপ কোনো পাশ্চাত্য জাতির পক্ষছায়ার আবরণ থেকে মুক্ত। এই বিদেশীয় সভ্যতা, যদি একে সভ্যতা বলো, আমাদের কী অপহরণ করেছে তা জানি; সে তার পরিবর্তে দন্ড হাতে স্থাপন করেছে যাকে নাম দিয়েছে Law and order, বিধি এবং ব্যবস্থা, যা সম্পূর্ণ বাইরের জিনিস, যা দারোয়ানি মাত্র। পাশ্চাত্য জাতির সভ্যতা-অভিমানের প্রতি শ্রদ্ধা রাখা অসাধ্য হয়েছে। সে তার শক্তিরূপ আমাদের দেখিয়েছে, মুক্তিরূপ দেখাতে পারেনি। অর্থাৎ, মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধ সব চেয়ে মূল্যবান এবং যাকে যথার্থ সভ্যতা বলা যেতে পারে, তার কৃপণতা এই ভারতীয়দের উন্নতির পথ সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ করে দিয়েছে। অথচ, আমার ব্যক্তিগত সৌভাগ্যক্রমে মাঝে মাঝে মহদাশয় ইংরেজের সঙ্গে আমার মিলন ঘটেছে। এই মহত্ত্ব আমি অন্য কোনো জাতির কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখতে পাইনি। এঁরা আমার বিশ্বাসকে ইংরেজ জাতির প্রতি আজও বেঁধে রেখেছেন। দৃষ্টান্তস্থলে এন্ড্রুজের নাম করতে পারি; তার মধ্যে যথার্থ ইংরেজকে, যথার্থ খৃষ্টানকে, যথার্থ মানবকে বন্ধুভাবে অত্যন্ত নিকটে দেখবার সৌভাগ্য আমার ঘটেছিল। আজ মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষণীতে স্বার্থসম্পর্কহীন তার নির্ভীক মহত্ত্ব আরো জ্যোতির্ময় হয়ে দেখা দিয়েছে। তার কাছে আমার এবং আমাদের সমস্ত জাতির কৃতজ্ঞতার নানা কারণ আছে, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে একটি কারণে আমি তার কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ। তরুণ বয়সে ইংরেজি সাহিত্যের পরিবেশের মধ্যে যে ইংরেজ জাতিকে আমি নির্মল শ্রদ্ধা একদা সম্পূর্ণচিত্তে নিবেদন করেছিলেম, আমার শেষ বয়সে তিনি তারই জীর্ণতা ও কলঙ্ক- মোচনে সহায়তা করে গেলেন। তার স্মৃতির সঙ্গে এই জাতির মর্মগত মাহাত্ম্য আমার মনে ধ্রুব হয়ে থাকবে। আমি এঁদের নিকটতম বন্ধু বলে গণ্য করেছি এবং সমস্ত

মানবজাতির বন্ধু বলে মান্য করি। এঁদের পরিচয় আমার জীবনে একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদরূপে সঞ্চিত হয়ে রইল। আমার মনে হয়েছে, ইংরেজের মহত্ত্বকে এঁরা সকল প্রকার নৌকোডুবি থেকে উদ্ধার করতে পারবেন। এঁদের যদি না দেখতুম এবং না জানতুম তা হলে পাশ্চাত্য জাতির সম্বন্ধে আমার নৈরাশ্য কোথাও প্রতিবাদ পেত না।

এমন সময় দেখা গেল, সমস্ত য়ুরোপে বর্বরতা কী রকম নখদন্ত বিকাশ করে বিভীষিকা বিস্তার করতে উদ্যত। এই মানবপীড়নের মহামারী পাশ্চাত্য সভ্যতার মজ্জার ভিতর থেকে জাগ্রত হয়ে উঠে আজ মানবাত্মার অপমানে দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত বাতাস কলুষিত করে দিয়েছে। আমাদের হতভাগ্য নিঃসহায় নীরন্ধ্র অকিঞ্চনতার মধ্যে আমরা কি তার কোনো আভাস পাই নি?

ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনেরদ্বারা একদিন-না-একদিন ইংরেজকে এই ভারতসাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু কোন্ ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে? কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে? একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে, তখন এ কী বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্বিষহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে? জীবনের প্রথম আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম য়ুরোপের অন্তরের সম্পদ এই সভ্যতার দানকে। আর আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল। আজ আশা করে আছি, পরিত্রাণকর্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্র্যলাঞ্ছিত কুটিরের মধ্যে; অপেক্ষা করে থাকব, সভ্যতার দৈববাণী সে নিয়ে আসবে, মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনাবে এই পূর্বদিগন্ত থেকেই। আজ পারের দিকে যাত্রা করেছি — পিছনের ঘাটে কী দেখে এলুম, কী রেখে এলুম, ইতিহাসের কী অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ট সভ্যতাভিমানের পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপ! কিন্তু, মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব। আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর-এক দিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়-যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎমর্যাদা ফিরে পাবার পথে। মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।

এই কথা আজ বলে যাব, প্রবলপ্রতাপশালীরও ক্ষমতা মদমত্ততা আত্মম্ভরিতা যে নিরাপদ নয় তারই প্রমাণ হবার দিন আজ সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে; নিশ্চিত এ সত্য প্রমাণিত হবে যে —

অধর্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি — সমূলন্তু বিনশ্যতি॥

ঐ মহামানব আসে,
দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে
মর্তধূলির ঘাসে ঘাসে।
সুরলোকে বেজে ওঠে শঙ্খ,
নরলোকে বাজে জয়ডঙ্ক —
এল মহাজন্মের লগ্ন।
আজি অমারাত্রির দুর্গতোরণ যত
ধূলিতলে হয়ে গেল ভগ্ন।
উদয়শিখরে জাগে মাভৈঃ মাভৈঃ রব
নবজীবনের আশ্বাসে।
'জয় জয় জয় রে মানব-অভ্যুদয়'
মন্দ্রি উঠিল মহাকাশে।

◆ ◆

## শব্দার্থ ও টীকা

**জগদ্দল**— পৃথিবী দলন করে এমন; এমন গুরুভার যে নড়ানো যায় না।
**অহিফেন বিষে**— আফিমের বিষে।
**এন্ড্রুজ**— প্রকৃতনাম চার্লজ ফ্রিজার এন্ড্রুজ। জন্ম ১৮৭১, মৃত্যু ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দ। ইংরজ মিশনারী, অধ্যাপক, মানবদরদী এন্ড্রুজ ১৯০৪ খ্রিষ্টাব্দে ভারতে আসেন। কিছুদিন দিলির সেন্ট স্টিফেন্স কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দে

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় ঘটে। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আশ্রমবিদ্যালয়ে যোগদান করেন।

**নীরন্ধ্র**— রন্ধ্র বা ছিদ্র নেই এমন, ফাঁকহীন, চারিদিক রুদ্ধ এমন।

**অকিঞ্চনতা**— নিঃস্ব অবস্থা, সামান্যতা।

**পূর্বদিগন্ত**— 'পূর্বদিগন্ত' বলতে পাশ্চাত্যের বিপরীত অর্থাৎ প্রাচ্য দেশকে বুঝানো হয়েছে। পাশ্চাত্যের দেশগুলোকে **সাধারণত পশ্চিমের দেশ বলা হয়।**

অধর্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।

**ততঃ সপত্নান্ জয়তি** — সমূলস্তু বিনশ্যতি।

**অর্থ:** অধমের দ্বারা যে বিস্তৃত হয়, এক সময়ে তার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হয়। সে ভদ্রবেশ ধারণ করে এবং তার প্রতিপক্ষকে জয় করে নেয়। তারপর সে সমূলে ধ্বংস হয়।

## বস্তুসংক্ষেপ

রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত তীক্ষ্ম বক্তব্যের মাধ্যমে ইংরেজদের ঔপনিবেশিক নীতির সমালোচনা করেছেন। ইংরেজদের শাসন ভারতবাসীর উপর জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসেছে বলে প্রবন্ধকার মন্তব্য করেছেন। চীন দেশের মানুষকে নির্জীব করে রাখা, জাপান যখন চীন আক্রমণ করে তখন জাপানকে প্রশ্রয় প্রদান ইত্যাদি ইংরেজের পক্ষপাতমূলক সাম্রাজ্যবাদী নীতি রবীন্দ্রনাথকে বীতশ্রদ্ধ করে তোলে। তারা ভারতবাসীর মধ্যে অতি নৃশংস আত্মবিচ্ছেদ ঘটিয়ে শাসন কার্য পরিচালনায় ব্যস্ত। এই আত্মবিচ্ছেদ মূলত সাম্প্রদায়িক অসম্প্রীতি, মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি। যদিও ইংরেজ শাসন ভারতবর্ষকে প্রায় নিঃস্ব করেছে নির্দয় শোষণের মাধ্যমে, তবুও দু-একজন ইংরেজ আছেন ব্যক্তি হিসেবে যাঁদের শ্রদ্ধা করতেই হয়। এঁরা শিক্ষা বিস্তার ও মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যে জীবন উৎসর্গ করেছেন। চার্লস ফ্রিয়ার এন্ড্রুজ এদের একজন। রবীন্দ্রনাথের কাছে এদের মহত্ত্বের মূল্য অপরিসীম। ব্যক্তি-ইংরেজদের প্রতি শ্রদ্ধা থাকলেও সাম্রাজ্যবাদী শোষণের কারণে তিনি জীবনের প্রান্তিকে ইংরেজদের উপর বিশ্বাস রাখতে পারছেন না। কেননা, পাশ্চাত্য সভ্যতার অস্থি-মজ্জায় তিনি আবিষ্কার করেছেন মানবপীড়নের মহামারী। তবে এই মানবপীড়ক ইংরেজদের একদিন ভারতবর্ষ ত্যাগ করে যেতেই হবে। কিন্তু তারা ভারতকে হয়তো হীনবীর্য করেই যাবে। জীবনের সূচনাকালে যে ইংরেজদের উদারতা, জ্ঞান ও মানবতাবোধের প্রতি রবীন্দ্রনাথের অগাধ আস্থা জন্মেছিলো, শেষ জীবনে ওই বিশ্বাস তিনি স্থাপন করলেন প্রাচ্যের মানুষের উপর। মানুষই রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসের শেষ আশ্রয়স্থল এবং তাই তাঁর উক্তি: 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ।'

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন

**সংক্ষিপ্ত-উত্তরমূলক প্রশ্ন**

১. ইংরেজদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের শৈশবে গড়ে ওঠা শ্রদ্ধাবোধ তাঁর শেষ জীবনে কোন কারণে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে তা লিখুন।
২. ইংরেজদের ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার পরিণতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যে ভবিষ্যদ্বাণী করেন, তা উলেখ করুন।
৩. জীবনের প্রান্তিকে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত কোথায় স্থাপন করেছিলেন তা লিখুন।

**৩ নং সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের নমুনা-উত্তরঃ**

আশি বছর বেঁচেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তার মৃত্যুর বছর (১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে) রচিত 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে সুদীর্ঘ জীবৎকালে অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি যে বিশ্বাস পরিবর্তন করেছেন তার উলেখ আছে। প্রথম জীবনে পারিবারিক ও সামাজিক প্রভাবে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজদের প্রতি মোহাবিষ্ট হয়ে পড়েন। ইংল্যান্ড সফর ও ইংরেজি শিক্ষার কারণেও এই মোহ গাঢ়তর হয়। ইংরেজ জাতির শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রতি অনুরাগ এবং তাদের উদার মানবতাবাদী বক্তব্যের জন্যেই মূলত এই মোহের সৃষ্টি। কিন্তু বহির্বিশ্বে ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদী নীতিগ্রহণ এবং ভারতে 'ল এন্ড অর্ডার' রক্ষার নামে 'ডিভাইড এন্ড রুল' কার্যকর করে মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করায় রবীন্দ্রনাথ ইংরেজদের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠেন। এই অবস্থাতেও রবীন্দ্রনাথ মানুষের ওপর বিশ্বাস হারাননি। তবে এ মানুষ পশ্চিমের ইংরেজ শাসকেরা নয়, এরা পূর্বদিগন্তের দারিদ্র্যলাঞ্ছিত মানুষ। প্রাচ্যের এই মানুষই সভ্যতার সংকটকালে পরিত্রাণকর্তার ভূমিকায় কুটির থেকে এগিয়ে আসবে বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করেছেন। এ কারণে প্রথম জীবনের মোহ পরিত্যাগ করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের প্রান্তিকে দাঁড়িয়ে 'পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের' প্রত্যাশায় প্রাচ্যের মানুষের উপর আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করেছেন।

**প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ব্যাখ্যা লিখুন**

১. ইংরেজকে একদা মানব হিতৈষীরূপে দেখেছি এবং কী বিশ্বাসের সঙ্গে ভক্তি করেছি।
২. পাশ্চাত্য জাতির সভ্যতা-অভিমানের প্রতি শ্রদ্ধা রাখা অসাধ্য হয়েছে। সে তার শক্তিরূপ আমাদের দেখিয়েছে, মুক্তিরূপ দেখাতে পারেনি।
৩. মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব।

**১ নং ব্যাখ্যার নমুনা-উত্তরঃ**

আলোচ্য অংশটুকু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রবন্ধ 'সভ্যতার সংকট' থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। প্রথম জীবনে ইংরেজদের প্রতি মোহাবিষ্ট হওয়ার কারণে এখানে প্রবন্ধকারের উত্তর-জীবনের খেদোক্তি প্রকাশিত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে বিশ্বব্যাপী এক বিরাট পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন। ঔপনিবেশিক ভারতে ইংরেজ শাসনের ফলে তিনি শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রতি এই জাতির অনুরাগ দেখেছেন। বাল্যকালে লেখাপড়া করার জন্যে ইংল্যান্ড গিয়ে তিনি ইংরেজদের মানবতাবাদী বক্তব্য শ্রবণ করেন। ইংরেজি সাহিত্য পাঠের ফলেও তিনি মুগ্ধ হন। এ সব কারণে তিনি ইংরেজ জাতির প্রতি মোহাবিষ্ট হয়ে পড়েন। ভারতের শিক্ষিত শ্রেণীর একটি অংশ এটাও বিশ্বাস করতো যে, ভারতের স্বাধীনতা লাভ ইংরেজদের ইচ্ছা বা আনুকূল্য ছাড়া সম্ভব নয়। 'সভ্যতার সঙ্কট' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ এ সব বিবৃত করে এর অষ্টম অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত খেদোক্তিটি প্রকাশ করেছেন। কারণ জীবন অতিবাহিত করে সময় অতিক্রান্তির সঙ্গে সঙ্গে তিনি লক্ষ করেন পাশ্চাত্য সভ্যতার ধারক ইংরেজদের সভ্যতা বিনাশী ও মনুষ্যত্বের পরিপন্থী ভূমিকা। ভারতেও সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিভেদ সৃষ্টি করে শাসন করার ইংরেজদের ঘৃণ্য রীতি অনুসরণ করতে দেখে উদ্ধৃত বক্তব্যটি প্রদান করেন।

**রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর লিখুন**

১। 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধটি মূলত রবীন্দ্রনাথের আত্মসমালোচনার দলিল' — আলোচনা করুন।
২। 'ইংরেজ জাতি ও তার ঔদার্যের প্রতি জীবনের প্রান্তিকে এসে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাসহীন হয়ে পড়েছিলেন।' — 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধ অবলম্বনে উক্তিটি ব্যাখ্যা করুন।
৩. 'মানুষই ছিলো রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসের শেষ আশ্রয়স্থল।' — আলোচনা করুন।
৪. 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধ অনুসারে রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক মূল্যবোধের পরিচয় লিপিবদ্ধ করুন।

**২ নং রচনামূলক প্রশ্নের নমুনা-উত্তরঃ**

'সভ্যতার সংকট' রবীন্দ্রনাথের জীবনের প্রান্তিকে লিখিত শেষ রচনাগুলোর অন্যতম। এখানে তাঁর আত্ম-উন্মোচনের এক করুণ আলেখ্য রচিত হয়েছে। শৈশব থেকে গড়ে ওঠা কিছু বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ জীবনে ভেঙ্গে ফেলেছেন বলেই এই আত্ম-উন্মোচন খানিকটা করুণ ও মর্মস্পর্শী। তবে তা কোনভাবেই দ্বন্দ্ব-পীড়িত নয়। এই প্রবন্ধে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ ও ফ্যাসিবাদী ইউরোপের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ পর্যায়ে বিশ্ব রাজনীতির ক্ষেত্রে সময় ও সমকালীন ঘটনাবলীর অভিঘাণ ছিলো বড় নির্মম। সেই নির্মমতা দীর্ঘদিনে গড়ে তোলা সভ্যতা ও সংস্কৃতির সমৃদ্ধ ভিত, তার ঐতিহ্যবাহী মানবিক ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধসমূহ বিনষ্ট করার লক্ষ্যে সদর্প পদক্ষেপে এগিয়ে আসছিলো। আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রক্তাক্ত আঘাত তাতে বিস্ফোরক মাত্রা সংযোজন করে। এ সময় ইংল্যান্ড বা ইংরেজদের ভূমিকা ছিলো আগ্রাসী শক্তির পক্ষে। রবীন্দ্রনাথ এতে ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ হয়েছেন। কারণ, এই প্রবন্ধেই রবীন্দ্রনাথ তার ব্যক্তিজীবনের যে পূর্বাপর আলেখ্য তুলে ধরেছেন, তাতে দেখা যায়, শৈশবে তিনি ইংরেজদের প্রতি মোহাবিষ্ট ছিলেন। এর সঙ্গত কারণ এই যে, ইংরেজ শাসিত ভারত সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারায় অতিদ্রুত আধুনিকতার দিকে এগিয়ে যায়। তিনি বলেছেন, ইংরেজ জাতির সম্প্রসারণের ইতিহাসের সঙ্গে বাঙালি তথা উপমহাদেশীয় জীবনের বৃহৎ মানববিশ্বের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার ইতিহাস সম্পর্কিত। একটি মহৎ সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় হয় ইংরেজ শাসনের মাধ্যমে। বার্কের বাগ্মিতা, মেকলের বৈদগ্ধ্য, শেকস্‌পীয়ারের নাট্যদক্ষতা, বায়রনের স্বাধীনতাপ্রিয়তা সর্বোপরি ইংরেজদের রাজনৈতিক ঔদার্যের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার সুযোগ ঘটে। এ-সময় অনেক বাঙালির গভীর বিশ্বাস গড়ে উঠেছিলো যে, ইংরেজদের ঔদার্যে অথবা দাক্ষিণ্যে বিজিত জাতি স্বাধীনতা অর্জন করবে। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও এর অনুকূলবর্তী। তরুণ বয়সে ইংল্যান্ড গিয়ে পার্লামেন্টারিয়ান জন্ ব্রাইটের বক্তব্য শ্রবণ করে তিনি ইংরেজদের হৃদয়ের ব্যাপ্তি ও জাতিগত অসংকীর্ণতা দেখে মোহাবিষ্ট হন। রবীন্দ্রনাথ যে পারিবারিক পরিএন্ডলে মানুষ হয়েছিলেন, সেখানেও ইংরেজদের উচ্চাসন দান করা হয়েছিলো। ঠাকুর পরিবারে ওই কালের পরিবর্তিত ধর্মমত, লোকব্যবহার ও ন্যায়বুদ্ধির অনুশাসন অনুসৃত হয়। এই বাস্তব প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথের বেড়ে ওঠা এবং ইংরেজদের প্রতি অনুরাগের সৃষ্টি। তখনো তিনি সাহিত্যরচনায় অনেকটা কল্পনাবিলাসী।

জমিদারী দেখাশোনার কাজে বেরিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রথম বিশেষভাবে লক্ষ করেন ভারতবর্ষের জনসাধারণের নিদারুণ হৃদয়বিদারক দারিদ্র্য। ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষে অন্ন বস্ত্র শিক্ষা চিকিৎসা বাসস্থানহীন জনগণের পশুর ন্যায় বেঁচে থাকা রবীন্দ্রনাথকে পীড়িত করে। তিনি আবিষ্কার করেন যে, এটা প্রকৃতপক্ষে 'বহুকোটি জনসাধারণের প্রতি সভ্যজাতির অপরিসীম অবজ্ঞাপূর্ণ ঔদাসীন্য।' আর তখনই তাঁর কাছে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, সভ্যতা বা ঔদার্যেরদ্বারা নয়, যন্ত্রশক্তির সাহায্যে ইংরেজ তার বিশ্বকর্তৃত্ব রক্ষা করে চলেছে। জাপান যেখানে আধুনিক বিজ্ঞান চর্চা করে উন্নত হতে পারে, ইংরেজরা সেই বিজ্ঞানের যথাযথ বিস্তার ভারতবর্ষে ঘটায়নি। বহুজাতিক রাশিয়াতে জাত, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের মৌলিকচাহিদা পূরণ করা হয়। অথচ, ইংরেজ বহুজাতিক ভারতে 'ল এন্ড অর্ডার' রক্ষার নামে সাম্প্রদায়িক অসন্তোষ ও জাতি-বিদ্বেষ জিইয়ে রেখেছে। এটা মূলত ইংরেজদের 'ডিভাইড এন্ড রুল' নীতির অংশ। রবীন্দ্রনাথ ইংরেজদের ঔপনিবেশিক নীতির কঠোর সমালোচনা করেছেন। কারণ —

১. ইংরেজের কথিত সভ্যশাসনের জগদ্দল পাথর ভারতবর্ষের বুকে চাপিয়ে দেয়া, যে-কারণে ভারত নিশ্চল।
২. চৈনিকদের মতো প্রাচীন সভ্য জাতিকে আফিম খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা।
৩. জাপানের চীন আক্রমণকালে ওই দস্যুবৃত্তিকে প্রশ্রয় দেয়া।
৪. স্পেনের গণপ্রজাতান্ত্রিক সরকারের পতন ঘটানো।

এইসব ঘটনার ফলে রবীন্দ্রনাথের ইংরেজের সভ্যশাসনের প্রতি যে শ্রদ্ধাবোধ শৈশবে গড়ে উঠেলিো তা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। প্রকৃতপক্ষে ইংরেজদের এই সাম্রাজ্যবাদী কার্যকলাপের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সভ্যতার সংকটের কারণ সন্ধান ও শনাক্ত করেন। বর্তমান বিশ্বে সাম্রজ্যবাদের চরিত্রের খানিকটা রকমফের হলেও মৌল পরিবর্তন ঘটেনি।

**পাঠ-৩.১**

# যৌবনে দাও রাজটিকা

**প্রমথ চৌধুরী**
**(১৮৬৮-১৯৪৬)**

## উদ্দেশ্য

## এই পাঠ শেষে আপনি—

- আমাদের সমাজে প্রাচীনপন্থীরা যৌবন বলতে কি বোঝেন তা বলতে পারবেন।
- সংস্কৃত কবিরা যৌবনকে কোন অর্থে ব্যবহার করেছেন সে-কথা বিবৃত করতে পারবেন।
- যৌবনের প্রকৃত ধর্ম কি তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

## ভূমিকা

বাংলা গদ্য সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে একক ও অনন্য। শুধু গদ্যভঙ্গিই নয়, বিষয় নির্বাচনেও তিনি অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র। তিনি ছিলেন মূলত যৌবন বন্দনাকারী। জড়তাগ্রস্ত স্থবির বাঙালি সমাজজীবনে প্রাণসঞ্চার ও নবজীবন প্রতিষ্ঠাই ছিলো তাঁর কাম্য। 'যৌবনে দাও রাজটিকা' প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরী দৈহিক যৌবনের চেয়ে সামাজিক যৌবনের অধিক প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরে একে রাজসম্মানে ভূষিত করতে বলেছেন। প্রবন্ধটিতে প্রমথ চৌধুরীর স্বতন্ত্র গদ্যরীতির পরিচয়ও লভ্য।

## লেখক পরিচিতি

প্রমথ চৌধুরী ১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দের ৭ আগস্ট পাবনা জেলার হরিপুরে জমিদার চৌধুরী বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম দুর্গাদাস চৌধুরী। প্রমথ চৌধুরীর শিক্ষাজীবন বিচিত্র ধারায় অগ্রসর হয়। তিনি কলিকাতা ডেভিড হেয়ার স্কুল থেকে এন্ট্রান্স এবং প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে দর্শন বিষয়ে প্রথম শ্রেণীতে বি.এ পাশ করেন। ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম শ্রেণীতে ইংরেজি বিষয়ে এম.এ পাশ করে ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে আইন পড়তে যান ইংল্যান্ড। সেখান থেকে ব্যারিস্টারি পাশ করে দেশে ফিরে কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় যোগ দেন। পরে আইন কলেজেও অধ্যাপনা করেন। বিবাহ করেন ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দে; কনে ইন্দিরা দেবী। ইন্দিরা দেবী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা। প্রথম চৌধুরী আইনজীবী হলেও সুকুমার সাহিত্যচর্চাকে তিনি সর্বদা পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন এবং নিজেও ছিলেন সে-পথের পথিক। ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

কবিতা, ছোটগল্প ও প্রবন্ধ রচনায় প্রথম চৌধুরী যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দেন। ভাষায় সুষম বিন্যাস ও অলঙ্কারের যথাযথ প্রয়োগ তাঁর রচিত কবিতাকে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ করে। সনেট রচয়িতা হিসেবেও তাঁর পরিচয় সমধিক। মূলত ইটালীয় সনেট রীতিকে তিনি অনুসরণ করেছেন। শব্দচয়ন, তীক্ষ, উজ্জ্বল ও চাপা ব্যঙ্গের সরসতায় তাঁর কাব্যদেহ গঠিত। ছোটগল্প রচনাতেও তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত প্রতিভা ও উজ্জ্বল ভাষাশিল্পের দুর্লভ সমন্বয় ঘটেছে। তিনি কিছুটা আয়াস-সাধ্য রীতিতে গল্প উপস্থাপন করলেও সে কৃত্রিমতা স্পষ্ট না হয়ে বরং অধিক হৃদয়গ্রাহ্য হয়ে উঠেছে তাঁর কারুকার্যময়তা। তিনি যে প্রবন্ধাবলী রচনা করেন তাতে চলিত কথ্যভাষার মার্জিত প্রয়োগ দেখা যায়। প্রখর বুদ্ধিদীপ্তি, অপূর্ব বাকচাতুর্য, পরিশীলিত রুচি, বলিষ্ঠ যুক্তিপ্রবণতা এবং সুমধুর অথচ ধারালো হাস্যরসাত্মক ভঙ্গির সাহায্যে তিনি বাংলা গদ্যকে নতুন করে প্রাণদান করেন। 'ভারতী' (১৮৭৭) পত্রিকায় প্রকাশিত 'হালখাতা' তাঁর চলিত রীতির প্রথম রচনা। পরে তা 'বীরবলের হালখাতা' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় মাসিক 'সবুজপত্র' নামক সাহিত্য পত্রিকা। পত্রিকাটি বাংলা গদ্যের উন্নতি সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রমথ চৌধুরীর উলে-খযোগ্য গ্রন্থগুলো হচ্ছে: **'সনেট পঞ্চাশৎ'** (১৯১৩), **'বীরবলের হালখাতা'** (১৯১৬), **'চার-ইয়ারী কথা'** (১৯১৬), **'পদ-চারণ'** (১৯১৯), **'প্রবন্ধ-সংগ্রহ'** (১৯৫২-৫৩)।

## পাঠ পরিচিতি

প্রমথ চৌধুরীর নিজের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'সবুজপত্র' পত্রিকার ১৩২১ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় 'যৌবনে দাও রাজটিকা' নামক তাঁর প্রবন্ধ প্রথম মুদ্রিত হয়। প্রবন্ধটি মূলত সমালোচনাধর্মী। 'সবুজপত্র' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তর কবিতা 'সবুজ পাতার গান'। এতে কবি যৌবনের জয়গান করেন এবং যৌবনকে রাজটিকা পরাবার প্রস্তাব দেন। এর সমালোচনায় মুখর হন তৎকালীন কতিপয় ব্যক্তি। প্রমথ চৌধুরী এই সমালোচকদের বক্তব্যের জবাবে 'যৌবনে দাও রাজটিকা' প্রবন্ধটি রচনা এবং তা 'বীরবল' ছদ্মনামে 'সবুজপত্রে' প্রকাশ করেন। পরে তা 'বীরবলের হালখাতা' গ্রন্থভুক্ত হয়। প্রমথ চৌধুরীর মৃত্যুর পর তাঁর প্রবন্ধগুলোর সমন্বয়ে বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত' হয় অতুলচন্দ্র গুপ্ত সংকলিত 'প্রবন্ধ-সংগ্রহ' নামক গ্রন্থ। প্রবন্ধটি এর দ্বিতীয় খন্ডের 'বিচিত্র' শিরোনামের অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। এখানে মূলত যৌবনের জয়গান করা হয়েছে। মানব জীবনে যৌবনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে প্রবন্ধকার দেখাতে চেয়েছেন যে, যৌবন বয়সের ব্যাপার নয়, মনের ব্যাপার। তিনি মানসিক যৌবন প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। ব্যক্তি-জীবনে যেমন, তেমনি সামাজিক জীবনেও এই মানসিক যৌবন প্রতিষ্ঠার কথা ব্যক্ত হয়েছে প্রবন্ধটিতে। সেদিক থেকে প্রবন্ধটির নামকরণ যথাযথ হয়েছে বলা চলে।

প্রবন্ধের সূচনায় সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা প্রসঙ্গে জনৈক টীকাকারের বক্তব্যের কিছু অংশের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমথ চৌধুরী নিজের অভিমত তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। আমাদের সমাজ জড়তাগ্রস্ত ও স্থবির। কারণ এখানে যৌবনের চতুর্দিকে অদৃশ্য দেয়াল তুলে রাখা হয়। এ সমাজ যৌবনকে আত্তীকরণের বদলে অতিক্রম করতে চায়। ব্যক্তির দৈহিক যৌবন ক্ষণস্থায়ী ও সামান্য। কিন্তু মানসিক যৌবন অপরিসীম এবং এর প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী। এই মানসিক যৌবনকে সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত করা জরুরি। অথচ, আমাদের শিল্প-সাহিত্যে এর আয়োজন নেই। সংস্কৃত সাহিত্যে যৌবন আছে, কিন্তু তা একান্তই দেহ নির্ভর। সেখানে সৃষ্টিধর্মের চেয়ে ভোগস্পৃহাই অধিক স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কৌশাম্বির যুবরাজ উদয়ন ও কপিলাবস্তুর যুবরাজ সিদ্ধার্থ উভয়েই সমসাময়িক ছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যে সিদ্ধার্থ অর্থাৎ গৌতম বুদ্ধের স্থান অতি সামান্য হলেও উদয়ন-কথকতা এর বহু স্থান জুড়ে। গৌতম বুদ্ধ ত্যাগ ও নির্বাণ লাভের পথ অনুসরণ করেছেন, আর উদয়ন ছিলেন কামকেলিতে মত্ত। সংস্কৃত সাহিত্যে কামের স্থান হলো, কিন্তু ত্যাগধর্ম মূল্য পেলো না।

আমরা যৌবনকে সন্দেহের চোখে দেখি। কারণ সেখানে সৃষ্টিশীলতা কেউ আবিষ্কার করেন নি। যৌবন আমাদের বিচারে উন্মত্ততার প্রতীক, তাই বিপদজনক। পন্ডিতগণ তাই তাঁদের শিল্প-সাহিত্যে শৈশব থেকে এক লাফে বার্ধক্যে পৌঁছতে পরামর্শ দেন। তাঁদের শিক্ষানীতি ছাত্রদের রাতারাতি ইঁচড়ে পাকা বানাবার জন্যে তৈরি। এর ফলে আমাদের সমগ্র জাতি যেন এক অকাল-বার্ধক্য আর অন্তঃসারশূন্য জ্ঞানভারে নুয়ে পড়ছে এবং এটাই স্বাভাবিক মনে হচ্ছে সবার কাছে। অথচ যৌবনে কামের পাশাপাশি আছে প্রেম, ইন্দ্রিয়বিলাসের পাশাপাশি সৃষ্টির প্রেরণা, অদম্য আবেগের পাশাপাশি শান্তির স্থিতি। যৌবনে যাঁরা শুধু নেতি ও উশৃঙ্খলতার গন্ধ খোঁজেন, তাঁরা প্রকৃতপক্ষে এর ইতিবাচক দিকটি কৌশলে এড়িয়ে যেতে চান। কারণ তাঁরা ভয় পান যৌবনকে। এই আতঙ্কগ্রস্ততার ফলে আমাদের জীবন নামক গ্রন্থটির ভূমিকা (শৈশব) আছে, উপসংহার (বার্ধক্য) আছে কিন্তু ভেতরের সব কিছুই পরিত্যাজ্য। অর্থাৎ যৌবন নেই।

প্রমথ চৌধুরী এই যৌবনকে যথাযোগ্য মর্যাদা দানের কথা বলেছেন। দৈহিক যৌবন অনিত্য বলে মানসিক যৌবনের বন্দনা করেছেন তিনি। দেহের যৌবন অন্যের মধ্যে সঞ্চারিত করা যায় না, কিন্তু মনের যৌবন দিয়ে অন্যকে উদ্দীপ্ত করা সম্ভব।

সমাজজীবনে প্রতিনিয়ত নতুন চিন্তাধারা, নতুন আশা-আকা ক্ষা এবং আত্ম-প্রণোদনা জাগিয়ে একে প্রগতিমুখী করার মধ্যেই প্রকৃতপক্ষে সম্ভব যথাযথ যৌবন-বন্দনার।

# মূলপাঠ

গত মাসের সবুজপত্রে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত যৌবনকে রাজটিকা দেবার প্রস্তাব করেছেন। আমার কোনো টীকাকার বন্ধু এই প্রস্তাবের বক্ষ্যমাণ-রূপ ব্যাখ্যা করেছেন —

'যৌবনকে টিকা দেওয়া অবশ্যকর্তব্য, তাহাকে বসন্তের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য। এ স্থলে রাজটিকা অর্থ — রাজা অর্থাৎ যৌবনের শাসনকর্তা কর্তৃক তাহার উপকারার্থে দত্ত যে টিকা, সেই টিকা। উক্ত পদ তৃতীয়াতৎপুরুষ সমাসে সিদ্ধ হইয়াছে।'

উলিখিত ভাষ্য আমি রহস্য বলে মনে করতুম যদি-না আমার জানা থাকত যে, এ দেশে জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের মতে মনের বসন্তঋতু ও প্রকৃতির যৌবনকাল — দুই অশায়েস্তা, অতএব শাসনযোগ্য। এ উভয়কে জুড়িতে জুতলে আর বাগ মানানো যায় না; অতএব এদের প্রথমে পৃথক্ ক'রে পরে পরাজিত করতে হয়।

বসন্তের স্পর্শে ধরণীর সর্বাঙ্গ শিউরে ওঠে; অবশ্য তাই বলে পৃথিবী তার আলিঙ্গন হতে মুক্তিলাভ করবার চেষ্টা করে না, এবং পোষ-মাসকেও বারোমাস পুষে রাখে না। শীতকে অতিক্রম করে বসন্তের কাছে আত্মসমর্পণ করায় প্রকৃতি যে অর্বাচীনতার পরিচয় দেয় না, তার পরিচয় ফলে।

প্রকৃতির যৌবন শাসনযোগ্য হলেও তাকে শাসন করবার ক্ষমতা মানুষের হাতে নেই; কেননা, প্রকৃতির ধর্ম মানবধর্মশাস্ত্রবহির্ভূত। সেই কারণে জ্ঞানীব্যক্তিরা আমাদের প্রকৃতির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে বারণ করেন, এবং নিত্যই আমাদের প্রকৃতির উলটো টান টানতে পরামর্শ দেন; এই কারণেই মানুষের যৌবনকে বসন্তের প্রভাব হতে দূরে রাখা আবশ্যক। অন্যথা, যৌবন ও বসন্ত এ দুয়ের আবির্ভাব যে একই দৈবশক্তির লীলা — এইরূপ একটি বিশ্বাস আমাদর মনে স্থানলাভ করতে পারে।

এ দেশে লোকে যে যৌবনের কপালে রাজটিকার পরিবর্তে তার পৃষ্ঠে রাজদন্ড প্রয়োগ করতে সদাই প্রস্তুত, সে বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ নেই। এর কারণ হচ্ছে যে, আমাদের বিশ্বাস মানবজীবনে যৌবন একটা মস্ত ফাঁড়া — কোনোরকমে সেটি কাটিয়ে উঠতে পারলেই বাঁচা যায়। এ অবস্থায় কি জ্ঞানী, কি অজ্ঞানী সকলেই চান যে, একলম্ফে বাল্য হতে বার্ধক্যে উত্তীর্ণ হন। যৌবনের নামে আমরা ভয় পাই, কেননা তার অন্তরে শক্তি আছে। অপরপক্ষে বালকের মনে শক্তি নেই, বৃদ্ধের দেহে শক্তি নেই, বালকের জ্ঞান নেই, বৃদ্ধের প্রাণ নেই। তাই আমাদের নিয়ত চেষ্টা হচ্ছে দেহের জড়তার সঙ্গে মনের জড়তার মিলন করা, অজ্ঞতার সঙ্গে বিজ্ঞতার সন্ধিস্থাপন করা। তাই আমাদের শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে ইঁচড়ে পাকানো, আর আমাদের সমাজনীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে জাগ দিয়ে পাকানো।

আমাদের উপরোক্ত চেষ্টা যে ব্যর্থ হয়নি তার প্রমাণ আমাদের সামাজিক জীবন। আজকের দিনে এ দেশে রাজনীতির ক্ষেত্রে একদিকে বালক, অপরদিকে বৃদ্ধ ; সাহিত্যক্ষেত্রে একদিকে স্কুলবয়, অপরদিকে স্কুলমাস্টার; সমাজে একদিকে বাল্যবিবাহ, অপরদিকে অকালমৃত্যু; ধর্মক্ষেত্রে একদিকে শুধু ইতি ইতি, অপরদিকে শুধু নেতি নেতি ; অর্থাৎ একদিকে লোষ্ট্রকাষ্ঠও দেবতা, অপরদিকে ঈশ্বরও ব্রহ্ম নন। অর্থাৎ আমাদের জীবনগ্রন্থে প্রথমে ভূমিকা আছে, শেষে উপসংহার আছে; ভিতরে কিছু নেই। এ বিশ্বের জীবনের আদি নেই, অন্ত নেই, শুধু মধ্য আছে; কিন্তু তারই অংশীভূত আমাদের জীবনের আদি আছে, অন্ত আছে ; শুধু মধ্য নেই।

বার্ধক্যকে বাল্যের পাশে এনে ফেললেও আমরা তার মিলনসাধন করতে পারি নি; কারণ ক্রিয়া বাদ দিয়ে দুটি পদকে জুড়ে এক করা যায় না। তাছাড়া যা আছে তা নেই বললেও তার অস্তিত্ব লোপ হয়ে যায় না। এ বিশ্বকে মায়া বললেও তা অস্পৃশ্য হয়ে যায় না, এবং আত্মাকে ছায়া বললেও তা অদৃশ্য হয়ে যায় না। বরং কোনো-কোনো সত্যের দিকে পিঠ ফেরালে তা অনেক সময়ে আমাদের ঘাড়ে চড়ে বসে। যে যৌবনকে আমরা সমাজে স্থান দিই নি, তা এখন নানা বিকৃতরূপে নানা ব্যক্তির দেহ অবলম্বন করে রয়েছে। যাঁরা সমাজের সুমুখে জীবনের শুধু নান্দী ও ভরতবচন পাঠ করেন, তাঁদের জীবনের অভিনয়টা যবনিকার অন্তরালেই হয়ে থাকে। রুদ্ধ ও বদ্ধ করে রাখলে পদার্থমাত্রই আলোর ও বায়ুর সম্পর্ক হারায়, এবং সেইজন্য তার গায়ে কলঙ্ক ধরাও অনিবার্য। গুপ্ত জিনিসের পক্ষে দুষ্ট হওয়া স্বাভাবিক।

আমরা যে যৌবনকে গোপন করে রাখতে চাই, তার জন্য আমাদের প্রাচীন সাহিত্য অনেক পরিমাণে দায়ী। কোনো বিখ্যাত ইংরেজ লেখক বলেন যে, literature হচ্ছে criticism of life; ইংরেজি সাহিত্য জীবনের সমালোচনা হতে পারে, কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্য হচ্ছে যৌবনের আলোচনা।

সংস্কৃত সাহিত্যে যুবকযুবতী ব্যতীত আর কারও স্থান নেই। আমাদের কাব্যরাজ্য হচ্ছে সূর্যবংশের শেষ নৃপতি অগ্নিবর্ণের রাজ্য, এবং সে দেশ হচেছ অষ্টাদশবর্ষদেশীয়াদের স্বদেশ। যৌবনের যে ছবি সংস্কৃত দৃশ্য কাব্যে ফুটে উঠেছে, সে হচ্ছে ভোগবিলাসের চিত্র। সংস্কৃত কাব্যজগৎ মাল্যচন্দনবনিতা দিয়ে গঠিত এবং সে জগতের বনিতাই হচ্ছে স্বর্গ, ও মাল্যচন্দন তার উপসর্গ। এ কাব্যজগতের স্রষ্টা কিংবা দ্রষ্টা-কবিদের মতে প্রকৃতির কাজ হচ্ছে শুধু রমণীদেহের উপমা জোগানো, পুরুষের কাজ শুধু রমণীর মন জোগানো। হিন্দুযুগের শেষ কবি জয়দেব নিজের কাব্যসম্বন্ধে স্পষ্টাক্ষরে যে কথা বলেছেন, তাঁর পূর্ববর্তী কবিরাও ইঙ্গিতে সেই একই কথা বলেছেন। সে কথা এই যে, 'যদি বিলাস-কলায় কুতূহলী হও তো আমার কোমলকান্ত পদাবলী শ্রবণ করো।' এককথায় যে যৌবন যযাতি নিজের পুত্রদের কাছে ভিক্ষা করেছিলেন, সংস্কৃত কবিরা সেই যৌবনেরই রূপগুণ বর্ণনা করেছেন।

এ কথা যে কত সত্য, তা একটি উদাহরণের সাহায্যে প্রমাণ করা যেতে পারে। কৌশাম্বির যুবরাজ উদয়ন এবং কপিলাবস্তুর যুবরাজ সিদ্ধার্থ উভয়ে সমসাময়িক ছিলেন। উভয়েই পরম রূপবান্ এবং দিব্য শক্তিশালী যুবাপুরুষ; কিন্তু উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এইটুকু যে, একজন হচ্ছেন ভোগের আর একজন হচ্ছেন ত্যাগের পূর্ণ অবতার। ভগবান গৌতমবুদ্ধের জীবনের ব্রত ছিল মানবের মোহনাশ করে তাকে সংসারের সকল শৃঙ্খল হতে মুক্ত করা; আর বৎসরাজ উদয়নের জীবনের ব্রত ছিল ঘোষবতী বীণার সাহায্যে অরণ্যের গজকামিনী এবং অন্তঃপুরের গজগামিনীদের প্রথমে মুগ্ধ ক'রে পরে নিজের ভোগের জন্য তাদের অবরুদ্ধ করা। অথচ সংস্কৃত কাব্যে বুদ্ধচরিতের স্থান নেই, কিন্তু উদয়নকথায় তা পরিপূর্ণ।

সংস্কৃত ভাষায় যে বুদ্ধের জীবনচরিত লেখা হয়নি, তা নয়; তবে ললিতবিস্তরকে আর-কেউ কাব্য বলে স্বীকার করবেন না, এবং অশ্বঘোষের নাম পর্যন্তও লুপ্ত হয়ে গেছে। অপরদিকে উদয়ন-বাসবদত্তার কথা অবলম্বন করে যাঁরা কাব্যরচনা করেছেন, যথা ভাস গুণাঢ্য সুবন্ধু ও শ্রীহর্ষ ইত্যাদি, তাঁদের বাদ দিলে সংস্কৃত সাহিত্যের অর্ধেক বাদ পড়ে যায়। কালিদাস বলেছেন যে, কৌশাম্বির গ্রামবৃদ্ধেরা উদয়নকথা শুনতে ও বলতে ভালোবাসতেন; কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, কেবল কৌশাম্বির গ্রামবৃদ্ধ কেন, সমগ্র ভারতবর্ষের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই ঐ কথা-রসের রসিক। সংস্কৃত সাহিত্য এ সত্যের পরিচয় দেয় না যে, বুদ্ধের উপদেশের বলে জাতীয় জীবনে যৌবন এনে দিয়েছিল, এবং উদয়নের দৃষ্টান্তের ফলে অনেকের যৌবনে অকালবার্ধক্য এনে দিয়েছিল। বৌদ্ধধর্মের অনুশীলনের ফলে রাজা অশোক লাভ করেছিলেন সাম্রাজ্য; আর উদয়নধর্মের অনুশীলন করে রাজা অগ্নিবর্ণ লাভ করেছিলেন রাজযক্ষ্মা। সংস্কৃত কবিরা এ সত্যটি উপেক্ষা করেছিলেন যে, ভোগের ন্যায় ত্যাগও যৌবনেরই ধর্ম। বার্ধক্য কিছু অর্জন করতে পারে না ব'লে কিছু বর্জনও করতে পারে না। বার্ধক্য কিছু কাড়তে পারে না ব'লে কিছু ছাড়তেও পারে না — দুটি কালো চোখের জন্যও নয়, বিশ কোটি কালো লোকের জন্যও নয়।

◆ ◆

## শব্দার্থ ও টীকা

**সবুজপত্র** — প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত মাসিক পত্রিকা। ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষায় চলিত গদ্যরীতি প্রতিষ্ঠায় এই পত্রিকা বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করে এক লেখক গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও ছিলেন পত্রিকাটির নিয়মিত লেখক।

**সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত** — জন্ম ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দে, মৃত্যু ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কবি, তবে রবীন্দ্রানুসারী নন। কবিতায় নানা ধরনের ছন্দের সফল ব্যবহারের জন্যে তিনি 'ছন্দের যাদুকর' বলে পরিচিত।

**রাজটিকা** — রাজ্যাভিষেককালে রাজার ললাটে অঙ্কিত তিলক। এখানে 'স্বীকৃতি' অর্থে।

**জুড়িতে জুতলে**— একত্রে গ্রহণ করলে। এখানে প্রাকৃতিক যৌবন বসন্তকাল ও মানবের যৌবনকে গাড়ির পাশাপাশি দুই গরুর মতো সম্মিলনের কথা বলা হয়েছে।

**মানবধর্মশাস্ত্রবহির্ভূত** — মানুষের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য ও আচরিত রীতিনীতির বাইরে।

**রাজদন্ড** — রাজপদের নিদর্শনস্বরূপ রাজা যে দন্ড হস্তে বহন করেন; রাজবিধি অনুযায়ী শাস্তি। — এখানে দ্বিতীয় অর্থটি প্রযোজ্য।

**লোষ্ট্রকাষ্ঠ** — পাথর ও গাছপালা ইত্যাদি।

**নান্দী** — নাটকের প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণ।

**ভরতবচন** — নাটক শেষে মঙ্গল কামনা।

**অগ্নিবর্ণ** — সংস্কৃত কবি কালিদাস রচিত 'রঘুবংশ' মহাকাব্যের একটি চরিত্র। এখানে উলেখ আছে, রাজা সুদর্শনের পুত্র অগ্নিবর্ণ অর্থাৎ রাম। তাঁর রাজ্যে দৈহিক যৌবনের বড় বাড়াবাড়ি ছিলো।

**অষ্টাদশবর্ষীদেশীয়াদের স্বদেশ**— অগ্নিবর্ণের রাজ্য। সেখানে আঠার বছর বয়সী যুবতীদের প্রাধান্য ছিলো এবং তারা কামকেলিতে মত্ত থাকতো।

**মাল্যচন্দনবনিতা**— মালা চন্দন ও নারী।

**জয়দেব**—দ্বাদশ শতকের সংস্কৃত কবি। তিনি রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি ছিলেন। 'গীতগোবিন্দম্' তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। এই গ্রন্থে রাধা ও কৃষ্ণের প্রণয়লীলাকে উপলক্ষ করে আদিরসই প্রাধান্য পেয়েছে।

**বিলাস-কলায় কুতূহলী হওয়া**— মিলন বা প্রমোদের চরম মুহূর্ত সম্পর্কে অধিকতর আগ্রহান্বিত হওয়া।

**যযাতি—** মহাভারতে বর্ণিত চরিত্র। রাজা যযাতি হরিণ শিকারে গিয়ে দেবযানীকে বিয়ে করেন। শর্মিষ্ঠা দেবযানীর দাসী হয়ে যযাতির রাজভবনে আসার কিছুকাল পর গোপনে শর্মিষ্ঠাকেও রাজা যযাতি বিয়ে করেন এবং তিন পুত্রের জন্ম দেন। দেবযানী এই খবর জ্ঞাত হয়ে নিজের পিতা শুক্রাচার্যকে বিষয়টি আদ্যোপান্ত জানায়। শুক্রাচার্য রাগান্বিত হয়ে যযাতিকে অভিশাপ দেন এবং এতে যযাতির যৌবন বিলুপ্ত হয় ও তিনি জরাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। যৌবন ফিরে পাবার জন্যে যযাতি নিবিষ্ট চিত্তে প্রার্থনা করেন। এতে শুক্রাচার্য তুষ্ট হন। যযাতি নিজের জরা অন্যকে প্রদান করার ক্ষমতা লাভ করেন। যযাতির পুত্র পুরু পিতার জরা নিজে গ্রহণ করে তাকে যৌবন ফিরে পেতে সহায়তা করে। দীর্ঘদিন রাজ্য ভোগের পর যযাতি পুরুর কাছ থেকে জরা নিজে পুনরায় গ্রহণ এবং বাণপ্রস্থ অবলম্বন করেন। পুরু পিতার স্থানে সিংহাসনে বসে।

**কৌশাম্বির যুবরাজ উদয়ন—** রাজা শতানীকের পুত্র, মতান্তরে পৌত্র। পত্নীর নাম বাসবদত্তা। কৌশাম্বি নগরী তাদের রাজধানী ছিলো।

**কপিলাবস্তুর যুবরাজ সিদ্ধার্থ—** পরবর্তীকালে গৌতম বুদ্ধ নামে পরিচিত। কপিলাবস্তু নামক রাজ্যের রাজা শুদ্ধোধনের পুত্র; মাতার নাম মায়াদেবী।

**ঘোষবতী বীণা—** যুবরাজ উদয়নের বীণাযন্ত্রের নাম।

**বুদ্ধচরিত—** গৌতম বুদ্ধর জীবনবৃত্তান্ত।

**ললিতবিস্তর—** প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ কবি অশ্বঘোষ রচিত সংস্কৃত কাব্য।

**অশ্বঘোষ—** কবি। খ্রিষ্টিয় প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে জন্মগ্রহণ করেন এবং দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথমভাগে মহারাজা কনিষ্কের সভাকবি হন।

**ভাস গুণাঢ্য সুবন্ধ ও শ্রীহর্ষ—** চারজন প্রখ্যাত সংস্কৃত সাহিত্য রচয়িতা।

**কালিদাস—** বিখ্যাত সংস্কৃত কবি। 'মেঘদূতম্', 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' ইত্যাদি তাঁর প্রসিদ্ধ রচনা।

**উদয়নধর্ম—** যুবরাজ উদয়ন আচরিত রীতি; এখানে নারী সম্ভোগস্পৃহার কথাই বোঝানো হয়েছে।

### বস্তুসংক্ষেপ

যৌবনকে যথাযথভাবে বন্দনা করাই মানুষের স্বাভাবিক ও সাধারণ ধর্ম হওয়া উচিত। কিন্তু কেউ কেউ মানবমনের বসন্তঋতু অর্থাৎ যৌবনকালকে অশায়েস্তা বিবেচনা করে শাসনযোগ্য বলে মনে করেন। তাদের মতে, মানব জীবনের সমস্ত অঘটনের মূলে রয়েছে তার যৌবন। আর তাই বাল্যকাল থেকে একলাফে বার্ধক্যে উত্তীর্ণ হবার পরামর্শ তারা দিয়ে থাকেন। আমাদের শিক্ষানীতি বা সমাজনীতি এভাবে মানুষকে তরুণ বয়সেই ইঁচড়ে পাকা বুড়ো বানানোর কাজে তৈরি হয়েছে। এখানে প্রকৃত সাহিত্য, রাজনীতি, ধর্ম বা জ্ঞানের চর্চা নেই।

কারণ আমাদের জীবনগ্রন্থে ভূমিকাস্বরূপ বাল্যকাল ও উপসংহারস্বরূপ বার্ধক্যকাল থাকলেও মূল অংশ অর্থাৎ যৌবন পরিত্যাজ্য। প্রবন্ধকার প্রমথ চৌধুরী এ কারণে সমাজপতি ও পন্ডিতদের তীব্র সমালোচনা করেছে। তাঁর মতে, যারা যৌবনকে বাদ দেবার পক্ষপাতী তারা বাল্য ও বার্ধক্যের মিলনসাধন করতে পারেন নি। বরং যৌবনকে সমাজে ও জীবনে সমাদর না করায় গুপ্ত যৌবনের দুষ্ট প্রকাশ ঘটেছে অনেক ক্ষেত্রে। যৌবনের প্রতি এ ধরনের বিরূপ মনোভাবের পশ্চাতে ভারতের প্রাচীন সাহিত্য, বিশেষ করে সংস্কৃত সাহিত্য অনেকটা দায়ী। সংস্কৃত সাহিত্যে জীবনের সমালোচনার চেয়ে যৌবন-আলোচনার বাড়াবাড়ি দেখা যায়। এই যৌবন-আলোচনা প্রধানত আদিরসাত্মক। যুবরাজ গৌতম যৌবনে ত্যাগধর্ম প্রচার করে গেলেও সংস্কৃত সাহিত্যে এর স্থান সামান্য। কিন্তু যুবরাজ উদয়নের কামকেলির বিচিত্র বর্ণনায় সংস্কৃত সাহিত্য ভরপুর। ভোগের মতো ত্যাগও যে যৌবনের প্রধান ধর্ম এই সত্য সংস্কৃত কবিগণ উপলব্ধি না করার ফলে তাদের সৃষ্টিতে যৌবন শুধু রিরংসার প্রতীক হয়ে উঠেছে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন

**সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের উত্তর লিখুন**

১. আমাদের সমাজে প্রাচীনপন্থী পন্ডিতগণ যৌব-ধর্ম বলতে প্রধানত কী বুঝিয়ে থাকেন?
২. সমাজে যৌবনের দুষ্ট প্রকাশ ঘটে কেন?
৩. সংস্কৃত কবিগণ যৌবনের কোন্ দিকটিকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন?
৪. যৌবনের প্রকৃত ধর্ম কি?

**২ নং সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের নমুনা-উত্তরঃ**

'যৌবনে দাও রাজটিকা' প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরী বলেছেন যে, গুপ্ত জিনিসের পক্ষে দুষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। যৌবনকে গুপ্ত অবস্থায় রাখলে সে-ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার ঘটে। প্রকৃতপক্ষে, মানুষের জীবনে তার যৌবনকাল আগমন এক অনিবার্য সত্য। প্রকৃতিতে যেমন বসন্তকাল আসে মানবজীবনেও তেমনি আসে যৌবনকাল। কিন্তু প্রাচীনপন্থী পন্ডিত বা সমাজপতিদের বিবেচনায় মানুষের যৌবন অনেক ক্ষেত্রে ধর্মশাস্ত্রবহির্ভূত কার্যে লিপ্ত হয়। তাই তারা পারতপক্ষে যৌবধর্মকে গুপ্ত রাখতে চান। তাদের তৈরি সমাজ বা শিক্ষানীতিতে বালককে এক ধাপে বার্ধক্যে পৌঁছে যাবার পরামর্শ দেয়া হয়। এ -কারণে যৌবন থেকে যায় গুপ্ত আর বালক প্রকৃত যুবক হবার বদলে হয়ে ওঠে ইঁচড়ে পাকা। এরাই সমাজে ও ব্যক্তিজীবনেও নানা অপরাধের জন্ম দিয়ে থাকে। পদার্থের ধর্ম যেমন, মানুষের মনোগত বৈশিষ্ট্যও তেমনি — এর স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত হলে তার উল্টো ফল ফলে।

**প্রসঙ্গ উলেখ করে ব্যাখ্যা লিখুন**

১. যৌবনের টিকা দেওয়া অবশ্যকর্তব্য, তাহাকে বসন্তের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য।
২. আমাদের জীবনগ্রন্থে প্রথমে ভূমিকা আছে, শেষে উপসংহার আছে, ভিতরে কিছু নেই।
৩. গুপ্ত জিনিসের পক্ষে দুষ্ট হওয়া স্বাভাবিক।
৪. ভোগের ন্যায় ত্যাগও যৌবনের ধর্ম।

**২ নং ব্যাখ্যার নমনা-উত্তর**

উদ্ধৃতাংশটুকু প্রথম চৌধুরীর 'যৌবনে দাও রাজটিকা' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। এই বাক্যটির মাধ্যমে প্রবন্ধকার আমাদের যৌবধর্ম পরিত্যাগী অন্তঃসারশূন্য জীবনের প্রসঙ্গ উলেখ করেছেন, কোন গ্রন্থের রূপকাশ্রয়ে।

সমাজপতি ও তথাকথিত পন্ডিতদের দেয়া ধারণা অনুসারে জীবন সম্পর্কে আমাদের এক অদ্ভুত বিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের এই জীবনদৃষ্টিতে মনুষ্যকালের শ্রেষ্ঠ সময় যৌবনকে উপেক্ষার কথা আছে। যৌবন সমস্ত অনাসৃষ্টির মূলে এবং যৌবন ধর্মশাস্ত্রবহির্ভূত যাবতীয় কর্মের উদ্গাতা। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে আমরা প্রাচীন পন্ডিতদের মত মান্য করে ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবন থেকে যৌবনকে নির্বাসন দিয়েছি। এর ফলে আমাদের বাল্য ও বার্ধক্যকাল থাকলেও যৌবনবিহীন জীবনযাপন চলছে দিনের পর দিন। প্রাবন্ধিক একটি গ্রন্থের রূপকে আমাদের জীবনের প্রসঙ্গ এনেছেন। এখানে বাল্যকালস্বরূপ ভূমিকা, বার্ধক্যকালস্বরূপ উপসংহার থাকলেও যৌবধর্মবিহীন অন্তঃসারশূন্যতা বিরাজিত। প্রমথ চৌধুরী উপর্যুক্ত বাক্যের মাধ্যমে জীবনের এই অন্তঃসারশূন্যতার বিরুদ্ধে শেষ প্রকাশ করেছেন।

**পাঠ-৩.২**

## উদ্দেশ্য

## এই পাঠ শেষে আপনি—

- সংস্কৃত সাহিত্যে কোন্ দুটো বিষয় প্রাধান্য পেয়েছে সেগুলো শনাক্ত করতে পারবেন।
- কিভাবে মানসিক যৌবন লাভ করা যায় তা বিবৃত করতে পারবেন।
- সমাজ জীবনে এই মানসিক যৌবন কিভাবে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব তা বলতে পারবেন।

# মূল পাঠ

পাছে লোকে ভুল বোঝেন বলে এখানে আমি একটি কথা বলে রাখতে চাই। কেউ মনে করবেন না যে, আমি কাউকে সংস্কৃত কাব্য বয়কট করতে বলছি কিংবা নীতি ও রুচির দোহাই দিয়ে সে কাব্যের সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশ করবার পরামর্শ দিচ্ছি। আমার মতে যা সত্য তা গোপন করা সুনীতি নয় এবং তা প্রকাশ করাও দুর্নীতি নয়। সংস্কৃতকাব্যে যে যৌবনধর্মের বর্ণনা আছে তা যে সামান্য মানবধর্ম, এ হচ্ছে অতি স্পষ্ট সত্য; এবং মানবজীবনের উপর তার প্রভাব যে অতি প্রবল, তাও অস্বীকার করবার জো নেই।

তবে এই একদেশদর্শিতা ও অত্যুক্তি — ভাষায় যাকে বলে একরোখামি ও বাড়াবাড়ি, তাই — হচ্ছে সংস্কৃত কাব্যের প্রধান দোষ। যৌবনের স্থূল শরীরকে অত আশকারা দিলে তা উত্তরোত্তর স্থূল হতে স্থূলতর হয়ে ওঠে, এবং সেই সঙ্গে তার সূক্ষ্ম শরীরটি সূক্ষ্ম হতে এত সূক্ষ্মতম হয়ে ওঠে যে, তা খুঁজে পাওয়াই ভার হয়। সংস্কৃত সাহিত্যের অবনতির সময় কাব্যে রক্তমাংসের পরিমাণ এত বেড়ে গিয়েছিল যে, তার ভিতর আত্মার পরিচয় দিতে হলে সেই রক্তমাংসের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করা ছাড়া আর আমাদের উপায় নেই। দেহকে অতটা প্রাধান্য দিলে মন-পদার্থটি বিগড়ে যায়; তার ফলে দেহ ও মন পৃথক্ হয়ে যায় এবং উভয়ের মধ্যে আত্মীয়তার পরিবর্তে জ্ঞাতিশত্রুতা জন্মায়। সম্ভবতঃ বৌদ্ধধর্মের নিরামিষের প্রতিবাদস্বরূপ হিন্দু কবিরা তাঁদের কাব্যে এতটা আমিষের আমদানি করেছিলেন। কিন্তু যে কারণেই হোক প্রাচীন ভারতবর্ষের চিন্তার রাজ্যে দেহমনের পরস্পরের যে বিচ্ছেদ ঘটেছিল, তার প্রমাণ — প্রাচীন সমাজের একদিকে বিলাসী অপরদিকে সন্ন্যাসী, একদিকে পত্তন অপরদিকে বন, একদিকে রঙ্গালয় অপরদিকে হিমালয়; এক কথায় এক দিকে কামশাস্ত্র অপরদিকে মোক্ষশাস্ত্র। মাঝামাঝি আর-কিছু জীবনে থাকতে পারত, কিন্তু সাহিত্যে নেই। এবং এ দুই বিরুদ্ধ-মনোভাবের পরস্পর-মিলনের যে কোনো পন্থা ছিল না, সে কথা ভর্তৃহরি স্পষ্টাক্ষরে বলেছেন —

একা ভার্যা সুন্দরী বা দরী বা

এই হচ্ছে প্রাচীনযুগের শেষ কথা। যাঁরা দরী-প্রাণ তাঁদের পক্ষে যৌবনের নিন্দা করা যেমন স্বাভাবিক, যাঁরা সুন্দরী-প্রাণ তাঁদের পক্ষেও তেমনি স্বাভাবিক। যতির মুখের যৌবন-নিন্দা অপেক্ষা কবির মুখের যৌবন-নিন্দায়, আমার বিশ্বাস, অধিক ঝাঁজ আছে। তার কারণ, ত্যাগীর অপেক্ষা ভোগীরা অভ্যাসবশতঃ কথায় ও কাজে বেশি অসংযত।

যাঁরা স্ত্রীজাতিকে কেবলমাত্র ভোগের সামগ্রী মনে করেন তাঁরাই যে স্ত্রী-নিন্দার ওস্তাদ, এর প্রমাণ জীবন ও সাহিত্যে নিত্য পাওয়া যায়। স্ত্রী-নিন্দুকের রাজা হচ্ছেন রাজকবি ভর্তৃহরি ও রাজকবি সোলোমন। চরম ভোগবিলাসে পরম চরিতার্থতা লাভ করতে না পেরে এঁরা শেষ বয়সে স্ত্রী-জাতির উপর গায়ের ঝাল ঝেড়েছেন। যাঁরা বনিতাকে মাল্যচন্দন হিসাবে ব্যবহার করেন তাঁরা শুকিয়ে গেলে সেই বনিতাকে মাল্যচন্দনের মতই ভূতলে নিক্ষেপ করেন, এবং তাকে পদদলিত করতেও সংকুচিত হন না। প্রথমবয়সে মধুর রস অতিমাত্রায় চর্চা করলে শেষ বয়সে জীবন তিতো হয়ে ওঠে। এ শ্রেণীর লোকের হাতে শৃঙ্গার-শতকের পরেই বৈরাগ্য-শতক রচিত হয়।

একই কারণে, যাঁরা যৌবনকে কেবলমাত্র ভোগের উপকরণ মনে করেন তাঁদের মুখে যৌবন-নিন্দা লেগে থাকবারই কথা। যাঁরা যৌবন জোয়ারে গা ভাসিয়ে দেন, তারা ভাটার সময় পাকে পড়ে গত জোয়ারের প্রতি কটুকাটব্য প্রয়োগ করেন। যৌবনের উপর তাঁদের রাগ এই যে, তা পালিয়ে যায় এবং একবার চলে গেলে আর ফেরে না। যযাতি যদি পুরুর কাছে ভিক্ষা করে যৌবন ফিরে না পেতেন তা হলে তিনি যে কাব্য কিংবা ধর্মশাস্ত্র রচনা করতেন, তাতে যে কি সুতীব্র যৌবন-নিন্দা থাকত তা আমরা কল্পনাও করতে পারি নে। পুরু যে পিতৃভক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন, তার ভিতর পিতার প্রতি

কতটা ভক্তি ছিল এবং তাতে পিতারই যে উপকার করা হয়েছিল তা বলতে পারি নে, কিন্তু তাতে দেশের মহা অপকার হয়েছে; কারণ নীতির একখানা বড় গ্রন্থ মারা গেছে।

যযাতি-কাঙ্ক্ষিত যৌবনের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ এই যে, তা অনিত্য। এ বিষয়ে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ, নগ্নক্ষপণক ও নাগরিক, সকলেই একমত।

'যৌবন ক্ষণস্থায়ী', এই আক্ষেপে এ দেশের কাব্য ও সংগীত পরিপূর্ণ —

ফাগুন গয়ী হয়, বহুরা ফিরি আয়ী হয়

গয়ে রে যোবন, ফিরি আওত নাহি

এই গান আজও হিন্দুস্থানের পথে-ঘাটে অতি করুণ সুরে গাওয়া হয়ে থাকে। যৌবন যে চিরদিন থাকে না, এ আপসোস রাখবার স্থান ভারতবর্ষে নেই।

যা অতি প্রিয় এবং ক্ষণস্থায়ী, তার স্থায়িত্ব বাড়াবার চেষ্টা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। সম্ভবত: নিজের অধিকার বিস্তার করবার উদ্দেশ্যেই এ দেশে যৌবন শৈশবের উপর আক্রমণ করেছিল। বাল্যবিবাহের মূলে হয়তো এই যৌবনের মেয়াদ বাড়াবার ইচ্ছাটাই বর্তমান। জীবনের গতিটি উলটো দিকে ফেরাবার ভিতরও একটা মহা আর্ট আছে। পৃথিবীর অপরসব দেশে লোকে গাছকে কি করে বড় করতে হয় তারই সন্ধান জানে, কিন্তু গাছকে কি করে ছোট করতে হয় সে কৌশল শুধু জাপানিরাই জানে। একটি বটগাছকে তারা চিরজীবন একটি টবের ভিতরে পুরে রেখে দিতে পারে। শুনতে পাই, এই সব বামন-বট হচ্ছে অক্ষয়বট। জাপানিদের বিশ্বাস যে, গাছকে হ্রস্ব করলে তা আর বৃদ্ধ হয় না। সম্ভবত: আমাদেরও মনুষ্যত্বের চর্চা সম্বন্ধে এই জাপানি আর্ট জানা আছে, এবং বাল্যবিবাহ হচ্ছে সেই আর্টের একটি প্রধান অঙ্গ। এবং উক্ত কারণেই, অপর-সকল প্রাচীন সমাজ উৎসন্নে গেলেও আমাদের সমাজ আজও টিঁকে আছে। মনুষ্যত্ব খর্ব করে মানবসমাজকে টবে জিইয়ে রাখায় যে বিশেষ-কিছু অহংকার করবার আছে, তা আমার মনে হয় না। সে যাই হোক, এ যুগে যখন কেউ যৌবনকে রাজটিকা দেবার প্রস্তাব করেন তখন তিনি সমাজের কথা ভাবেন, ব্যক্তিবিশেষের কথা নয়।

ব্যক্তিগত হিসেবে জীবন ও যৌবন অনিত্য হলেও মানবসমাজের হিসেবে ও-দুই পদার্থ নিত্য বললেও অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং সামাজিক জীবনে যৌবনের প্রতিষ্ঠা করা মানুষের ক্ষমতার বহির্ভূত না হলেও না হতে পারে।

কি উপায়ে যৌবনকে সমাজের যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করা যেতে পারে তাই হচ্ছে বিবেচ্য ও বিচার্য।

এ বিচার করবার সময় এ কথাটি মনে রাখা আবশ্যক যে, মানবজীবনের পূর্ণ অভিব্যক্তি — যৌবন।

যৌবনে মানুষের বাহ্যেন্দ্রিয় কর্মেন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয় সব সজাগ ও সবল হয়ে ওঠে, এবং সৃষ্টির মূলে যে প্রেরণা আছে মানুষে সেই প্রেরণা তার সকল অঙ্গে সকল মনে অনুভব করে।

দেহ ও মনের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধের উপর মানবজীবন প্রতিষ্ঠিত হলেও দেহমনের পার্থক্যের উপরেই আমাদের চিন্তারাজ্য প্রতিষ্ঠিত। দেহের যৌবনের সঙ্গে মনের যৌবনের একটা যোগাযোগ থাকলেও দৈহিক যৌবন ও মানসিক যৌবন স্বতন্ত্র। এই মানসিক যৌবন লাভ করতে পারলেই আমরা তা সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে পারব। দেহ সংকীর্ণ ও পরিচ্ছিন্ন ; মন উদার ও ব্যাপক। একের দেহের যৌবন অপরের দেহে প্রবেশ করিয়ে দেবার জো নেই ; কিন্তু একের মনের যৌবন লক্ষ লোকের মনে সংক্রমণ করে দেওয়া যেতে পারে।

পূর্বে বলেছি যে, দেহ ও মনের সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য। একমাত্র প্রাণশক্তিই জড় ও চৈতন্যের যোগ সাধন করে। যেখানে প্রাণ নেই সেখানে জড়ে ও চৈতন্যে মিলনও দেখা যায় না। প্রাণই আমাদের দেহ ও মনের মধ্যে মধ্যস্থতা করছে। প্রাণের পায়ের নীচে হচ্ছে জড়জগৎ আর তার মাথার উপরে মনোজগৎ। প্রাণের ধর্ম যে জীবনপ্রবাহ রক্ষা করা, নবনব সৃষ্টিরস্নারা সৃষ্টি রক্ষা করা — এটি সর্বলোকবিদিত। কিন্তু প্রাণের আর-একটি বিশেষ ধর্ম আছে, যা সকলের কাছে সমান প্রত্যক্ষ নয়। সেটি হচ্ছে এই যে, প্রাণ প্রতি মুহূর্তে রূপান্তরিত হয়। হিন্দুদর্শনের মতে জীবের প্রাণময় কোষ, অন্নময় কোষ ও মনোময় কোষের মধ্যে অবস্থিত। প্রাণের গতি উভয়মুখী। প্রাণের পক্ষে মনোময় কোষে ওঠা এবং অন্নময় কোষে নামা দুই সম্ভব। প্রাণ অধোগতি প্রাপ্ত হয়ে জড়জগতের অন্তর্ভূত হয়ে যায়; আর উন্নত হয়ে মনোজগতের অন্তর্ভূত হয়। মনকে প্রাণের পরিণতি এবং জড়কে প্রাণের বিকৃতি বললেও অত্যুক্তি হয় না। প্রাণের স্বাভাবিক গতি হচ্ছে মনোজগতের দিকে; প্রাণের স্বাধীন স্ফূর্তিতে বাধা দিলেই তা জড়তাপ্রাপ্ত হয়। প্রাণ নিজের অভিব্যক্তির নিয়ম নিজে গড়ে নেয়; বাইরের নিয়মে তাকে বদ্ধ করাতেই সে জড় জগতের অধীন হয়ে পড়ে। যেমন প্রাণিজগতের রক্ষার জন্য নিত্যনূতন প্রাণের সৃষ্টি আবশ্যক, এবং সে সৃষ্টির জন্য দেহের যৌবন চাই, তেমনি মনোজগতের এবং তদধীন কর্মজগতের রক্ষার জন্য

সেখানেও নিত্য নব সৃষ্টির আবশ্যক, এবং সে সৃষ্টির জন্য মনের যৌবন চাই। পুরাতনকে আঁকড়ে থাকাই বার্ধক্য অর্থাৎ জড়তা। মানসিক যৌবন লাভের জন্য প্রথম আবশ্যক — প্রাণশক্তি যে দৈবী শক্তি — এই বিশ্বাস।

এই মানসিক যৌবনই সমাজে প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে আমাদের উদ্দেশ্য। এবং কি উপায়ে তা সাধিত হতে পারে, তাই হচ্ছে আলোচ্য।

আমরা সমগ্র সমাজকে একটি ব্যক্তিহিসেবে দেখলেও আসলে মানব-সমাজ হচ্ছে বহুব্যক্তির সমষ্টি। যে সমাজে বহু ব্যক্তির মানসিক যৌবন আছে, সেই সমাজেরই যৌবন আছে। দেহের যৌবনের সঙ্গে সঙ্গেই মনের যৌবনের আবির্ভাব হয়। সেই মানসিক যৌবনকে স্থায়ী করতে হলে শৈশব নয়, বার্ধক্যের দেশ আক্রমণ ও অধিকার করতে হয়। দেহের যৌবনের অন্তে বার্ধক্যের রাজ্যে যৌবনের অধিকার বিস্তার করবার শক্তি আমরা সমাজ হতেই সংগ্রহ করতে পারি। ব্যক্তিগত জীবনে ফাল্গুন একবার চলে গেলে আবার ফিরে আসে না; কিন্তু সমগ্র সমাজে ফাল্গুন চিরদিন বিরাজ করছে। সমাজে নূতন প্রাণ, নূতন মন, নিত্য জন্মলাভ করছে। অর্থাৎ নূতন সুখদুঃখ, নূতন আশা, নূতন ভালোবাসা, নূতন কর্তব্য ও নূতন চিন্তা নিত্য উদয় হচ্ছে। সমগ্র সমাজের এই জীবন-প্রবাহ যিনি নিজের অন্তরে টেনে নিতে পারবেন, তাঁর মনের যৌবনের আর ক্ষয়ের আশঙ্কা নেই। এবং তিনিই আবার কথায় ও কাজে সেই যৌবন সমাজকে ফিরিয়ে দিতে পারবেন।

এ যৌবনের কপালে রাজটিকা দিতে আপত্তি করবেন, এক জড়বাদী আর-এক মায়াবাদী; কারণ এঁরা উভয়েই একমন। এঁরা উভয়েই বিশ্ব হতে অস্থির প্রাণটুকু বার করে দিয়ে যে এক স্থিরতত্ত্ব লাভ করেন, তাকে জড়ই বল আর চৈতন্যই বল, সে বস্তু হচ্ছে এক, প্রভেদ যা তা নামে।

◆ ◆

## শব্দার্থ ও টীকা

**একদেশদর্শিতা —** কোনো বিষয়ের একাংশমাত্র বিবেচনা না করা, সংকীর্ণতা, পক্ষপাতদুষ্টতা।

**মোক্ষশাস্ত্র —** ভববন্ধন হতে মুক্তির আচরণবিধি।

**ভর্তৃহরি —** সংস্কৃত কবি। রাজা বিক্রমাদিত্যের পিতা গন্ধর্ব সেনের দাসীপুত্র।

**সোলোমন —** একজন রাজকবি।

**শৃঙ্গার-শতক ও বৈরাগ্য-শতক —** সংস্কৃত কবি ভর্তৃহরি কর্তৃক রচিত দুটো কাব্যগ্রন্থ। 'নীতি-শতক' নামে তাঁর আরও একটি কাব্যগ্রন্থ আছে।

**কুটকাটব্য —** কড়া কথা, গালমন্দ।

**যযাতি-কাঙ্ক্ষিত —** যযাতি যা কামনা করেছেন।

**শ্রমণ —** বৌদ্ধ সন্ন্যাসী, ভিক্ষু।

**নগ্নক্ষপণক —** উলঙ্গ বৌদ্ধ সন্ন্যাসীবিশেষ।

**'ফাগুন গয়ী হয়, বহুরা ফিরি আয়ী হয় / গয়ে রে যৌবন, ফিরি আওত নাহি'—** ফাল্গুন চলে যায় সত্যি, কিন্তু তা বার বার ফিরে আসে। যৌবন চলে গেলে তা আর কখনো আসে না ফিরে।

**অক্ষয়বট —** ভুবনেশ্বর, প্রয়াস, পুরী প্রভৃতি তীর্থস্থানের প্রাচীন বটবৃক্ষ। মনে করা হয়, এই বটবৃক্ষের মূলে জলসেচন করে প্রার্থনা করলে অক্ষয় পূণ্য লাভ হয়।

**অভিষিক্ত —** গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত ব্যক্তির জন্যে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানকে বলে অভিষেক। অনুষ্ঠান সমাপনান্তে ওই ব্যক্তিটি হল অভিষিক্ত।

**বাহ্যেন্দ্রিয় —** চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহবা, ত্বক — এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়।

**কর্মেন্দ্রিয় —** যে সব ইন্দ্রিয়দ্বারা কর্ম সম্পাদন করা হয়। যেমন, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ।

**অন্তরিন্দ্রিয় —** মন, অন্তঃকরণ।

**পরিচ্ছিন্ন —** সীমাবদ্ধ।

**বার্ধক্যের রাজ্যে যৌবনের অধিকার বিস্তার —** যৌবনকে বার্ধক্য পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা।

**জড়বাদী —** জড়জগতের বাইরে কিছুই নেই বা জড়প্রকৃতির বাইরে কোন স্বতন্ত্র আত্মার অস্তিত্ব নেই — এই দার্শনিক মতের অনুসারী।

**মায়াবাদী —** জগৎ-জীবন সবই মিথ্যা — ব্রহ্মই শুধু সত্য; এই দার্শনিক মতের অনুসারী।

## বস্তুসংক্ষেপ

সংস্কৃত সাহিত্যের বিরুদ্ধে বিষোদগার প্রবন্ধকারের লক্ষ্য নয়, বরং সেখানে মানবধর্মের অতি সামান্য অংশ দেহজ যৌবনের যে বাড়াবাড়ি সে কথাই তিনি ব্যক্ত করেছেন। যৌবন মানেই শুধু স্থূল শরীর নয়, এসত্যটি সংস্কৃত কবিগণ বুঝতে চান নি। পরে অবশ্য এই রক্তমাংসের বাড়াবাড়ির একটা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। ভারতের প্রাচীন সাহিত্যে তাই একদিকে কাম অন্যদিকে মোক্ষ বা পরিত্রাণের কথা আছে, এর মাঝামাঝি কিছু নেই। ভর্তৃহরি, সোলোমান প্রমুখ রাজকবিও শুধু দেহের বন্দনা করেছেন ও স্ত্রী-জাতিকে ভোগের সামগ্রী করে তুলেছেন। যৌবন থেকে পালিয়ে গুহা-আশ্রয়ী সন্ন্যাসী যেমন যৌবনের নিন্দা করেছেন, তেমনি ভোগে পরিতৃপ্ত না হয়ে ভোগীও যৌবন-নিন্দায় পঞ্চমুখ হয়েছেন। কিন্তু তবুও এ দেশের মানুষ যৌবনের পরিধি বিস্তৃতির জন্যে বাল্যবিবাহ সমর্থন করে। অথচ এই যৌবনকে বার্ধক্য পর্যন্ত প্রসারিত করার কোন উদ্যোগ নেই তাদের। প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিজীবন থেকে সমাজজীবনে যদি এই যৌবন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়, তা হলেই এই ইতিনেতির অবসান হতে পারে। কিন্তু এ এক কঠিন পাঠ। মানবজীবনের পূর্ণ অভিব্যক্তি তার যৌবন, যখন তার বাহ্য, কর্ম ও অন্তরিন্দ্রিয় সজাগ হয়ে ওঠে। এ সময় তার মনোজগতেরও বিকাশ ঘটে। এতোদিন শরীরকে নির্ভর করে যৌবনের প্রশস্তি রচনা করা হয়েছে, যেখানে মন ছিলো সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত। অথচ দেহ সংকীর্ণ ও পরিচ্ছিন্ন, অন্যদিকে মন উদার ও ব্যাপক। এই মানসিক যৌবন লাভ করতে পারলেই তা সমাজে প্রতিষ্ঠা সম্ভব। দেহের যৌবন অন্যের দেহে সংক্রমিত করা যায় না, কিন্তু মনের যৌবন দিয়ে অন্যকে মানসিকভাবে উদ্দীপ্ত করা যায়। দেহের যৌবন ও মনের যৌবন পরস্পর বিরোধী কোন কিছু নয়। প্রাণিজগত রক্ষা ও প্রাণের সৃষ্টির জন্যে যেমন দেহের যৌবন দরকার, তেমনি মনোজগত ও কর্মজগত রক্ষার জন্যে প্রয়োজন মনের যৌবন। প্রমথ চৌধুরী ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণতায়, যুক্তির শাণিত ধারায় ও বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্যে প্রবন্ধে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করে স্পষ্ট বলেছেন যে, সমাজে মানসিক যৌবন প্রতিষ্ঠাই তাঁর উদ্দেশ্য। এ মানসিক যৌবনের সাহায্যেই কর্মে ও জ্ঞানে সামাজিক মানুষের মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ ফল লাভ করা সম্ভব। এরূপ যৌবনের রাজটিকা পরিয়ে অভিষিক্ত করতে নিশ্চয়ই কেউ আপত্তি করবে না, শুধু জড়বাদী ও মায়াবাদীগণ ছাড়া। কারণ এরা প্রাণের স্বতন্ত্র মূল্যে বিশ্বাসী নয়।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন

**সংক্ষিপ্ত-উত্তরমূলক প্রশ্ন**

১. প্রথম চৌধুরীর বিচারে সংস্কৃত কাব্যের প্রধান দোষ কি?
২. গুহাবাসী সন্ন্যাসীর যৌবন পরিত্যাগ ও যৌবনে অতি দেহভোগকারী উভয়েই যৌবন-নিন্দা করে, কেন?
৩. দেহের যৌবন থেকে মনের যৌবন স্বতন্ত্র, কোন অর্থে?
৪. সমাজের মানসিক যৌবন প্রতিষ্ঠার উপায় কি?

**২ নং সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের নমুনা-উত্তরঃ**

মানবজীবন দেহ ও মনের সংযোগে গঠিত। তারপরও একথা বলা যায় যে, মানুষের চিন্তার জগত দেহসম্পৃক্ত নয়। যৌবন মনুষ্যকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সময়। মানুষের বাহ্যেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় এ সময় অধিক সজাগ ও কর্মঠ থাকে। দৈহিক যৌবন এরদ্বারা অনেকটা প্রকাশিত হয়। কিন্তু অন্তরিন্দ্রিয় বলেও মানুষের একটি বিশেষ দিক থাকে। এ সময় তারও জাগরণ ঘটে। দেহের যৌবন একটি নির্দিষ্ট বয়ঃসীমা অতিক্রান্তির পরই অস্তমিত হয়; শিথিল হয়ে পড়ে ইন্দ্রিয়-শক্তি। তাছাড়া দেহ এক অর্থে সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধও বটে। কিন্তু মানুষের অন্তরিন্দ্রিয় অর্থাৎ মনোজাগতিক যৌবন বয়সে সীমাবদ্ধ নয় বলে মৃত্যুর পূর্ব অবধি এই যৌবন ধারণ করা সম্ভব। তাছাড়া দেহের মতো মন সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ নয়। এতে উদারতা ও ব্যাপকতার স্থান রয়েছে। মনের যৌবন এক থেকে বহুজনে সংক্রমিত করা যেতে পারে, কিন্তু দেহের যৌবন একদেহেই স্থাণু। আবার ওই দেহের বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যৌবন নিশ্চিতভাবে অস্তগামী হয়ে পড়ে। মনের যৌবন সামাজিক

বহুমানুষের মধ্যে সংক্রমিত করে সমাজে যৌবশক্তি সঞ্চার ঘটানো যায়। কিন্তু ব্যক্তিদেহের যৌবন থেকে তা একেবারেই অসম্ভব। এ সব কারণেই বলা চলে দেহের যৌবন ও মনের যৌবন স্বতন্ত্র।

**প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ব্যাখ্যা লিখুন**

১. মনুষ্যত্ব খর্ব করে মানবসমাজকে টবে জিইয়ে রাখায় যে বিশেষ কিছু অহংকার করার আছে, তা আমার মনে হয় না।
২. একের দেহের যৌবন অপরের দেহে প্রবেশ করিয়ে দেবার জো নেই; কিন্তু একের মনের যৌবন লক্ষ লোকের মনে সংক্রমণ করে দেওয়া যেতে পারে।
৩. প্রাণের স্বাভাবিক গতি হচ্ছে মনোজগতের দিকে; প্রাণের স্বাধীন স্ফূর্তিতে বাধা দিলেই তা জড়তাপ্রাপ্ত হয়।
৪. মানসিক যৌবন লাভের জন্যে প্রথম আবশ্যক — প্রাণশক্তি যে দৈবী শক্তি — এই বিশ্বাস।
৫. সমগ্র সমাজের এই জীবন প্রবাহ যিনি নিজের অন্তরে টেনে নিতে পারবেন, তার মনের যৌবনের আর ক্ষয়ের আশঙ্কা নেই।

**৪ নং ব্যাখ্যার নমুনা-উত্তর**

বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক প্রথম চৌধুরীর 'যৌবনে দাও রাজটিকা' প্রবন্ধ থেকে উপর্যুক্ত বাক্যটি উদ্ধৃত করা হয়েছে। এখানে প্রবন্ধকার বলেছেন যে, মানসিক যৌবন লাভের জন্যে দৈবশক্তির মতো একটি অমিত তেজ মনুষ্যপ্রাণে অনুভূত হওয়া জরুরি।

গতিশীলতা ও পরিবর্তনশীলতাই প্রাণের প্রধান বৈশিষ্ট্য। কারণ প্রাণ জড় পদার্থ নয়। তবে পৃথিবীর বস্তু ও প্রাণিজগতের সান্নিধ্যে নানা লীলাবৈচিত্র্যের মধ্যদিয়েই প্রাণের বহুবিচিত্র বিকাশ ঘটে। প্রাণ নিজের তৈরি নিয়মেই যথাযথভাবে অভিব্যক্ত হয়, বাইরের বা জড়জগতের প্রথাবদ্ধ নিয়মে তা স্থবির হয়ে পড়ে। মানসিক যৌবন মানুষের অন্তর্জগতের পরিবর্তন ঘটায় এবং তা অন্যের মনে যেহেতু সঞ্চারিত করা যায় সেহেতু সমাজও যৌবশক্তিতে বলীয়ান হয়ে ওঠে। কিন্তু এই মানসিক যৌবন লাভের জন্যে নিজের আত্মশক্তি বা প্রাণশক্তিতে একনিষ্ঠ থাকা জরুরি। একনিষ্ঠতা দৈবী শক্তির মতো প্রচন্ড ও প্রভাববিস্তারী হলেই মানসিক যৌবন লাভ সম্ভব হতে পারে।

**রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর লিখুন**

১. 'যৌবনে দাও রাজটিকা' প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরী প্রকৃত যৌবন বলতে কি বুঝিয়েছেন? সমাজে যৌবন রক্ষা করা যায় কিভাবে প্রবন্ধটি অবলম্বনে তা লিখুন।
২. প্রথম চৌধুরী তাঁর 'যৌবনে দাও রাজটিকা' প্রবন্ধে দৈহিক যৌবন নয়, মানসিক যৌবনের কথা বলে সমাজদেহে তা কেন সংক্রমণ করতে চেয়েছেন — বিস্তৃতভাবে বুঝিয়ে লিখুন।
৩. 'যৌবনে দাও রাজটিকা' প্রবন্ধে সংস্কৃত সাহিত্য সম্পর্কে যে বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে তা বিবৃত করুন।
৪. "প্রবন্ধ রচনায় প্রমথ চৌধুরী একটি বিশিষ্ট রীতির অনুসারী। 'যৌবনে দাও রাজটিকা' প্রবন্ধেও এর পরিচয় লভ্য।" — বক্তব্যটি প্রতিষ্ঠা করুন।

**২ নং রচনামূলক প্রশ্নের নমুনা-উত্তরঃ**

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মাসিক 'সবুজপত্রে' 'সবুজ পাতার গান' শিরোনামে কবিতায় যৌবনে রাজটিকা পড়ানোর প্রস্তাব দিলে জনৈক সমালোচক এর বিরূপ সমালোচনা করেন। প্রমথ চৌধুরী ওই সমালোচনার জবাবে রচিত 'যৌবনে দাও রাজটিকা' প্রবন্ধে যৌবনের প্রশস্তি পরিবেশন করেন। তবে এ যৌবন রক্তমাংসের দেহনির্ভর নয়, মনের বিশাল ও ব্যাপক ভাবএন্ডলে এর প্রতিষ্ঠা। কেন তিনি মানসিক যৌবনের কথা বলেছেন তা বিস্তৃতভাবে উলেখ আছে তাঁর প্রবন্ধে।

ব্যক্তিজীবন ও তার যৌবন অনিত্য। কিন্তু সামগ্রিকভাবে সমাজজীবনে তা যদি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় তবে সেটা নিত্য হয়ে ওঠে। সমাজজীবনে যৌবনের প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব নয়। যৌবনকে মনুষ্যজীবনের পূর্ণ অভিব্যক্তি হিসেবে বিবেচনা করে তা সমাজে প্রতিষ্ঠা করা যায়। দেহজ যৌবনের বাহ্য ও কর্মেন্দ্রিয় সচলতা মানুষকে প্রমত্ত করে তোলে। কিন্তু দেহের যৌবন সীমাবদ্ধ এবং এক দেহের বাইরে এর বিস্তারও অসম্ভব। মানুষ তবু দেহের যৌবনকেই প্রকৃত যৌবন বলে মনে

করে। ইন্দ্রিয় সচলতার এই কালে তার মধ্যে ভোগস্পৃহাও প্রাধান্য পায়। সংস্কৃত সাহিত্যে এই দেহজ কামনা ও ভোগলিপ্সা এতোটাই বিস্তার লাভ করেছে, যে কারণে মনে হয় যৌবন মানেই অনাচার, যৌবন মানেই রিরংসা। অথচ যৌবন যে ত্যাগেরও প্রতীক, গৌতম বুদ্ধ যে যুবক বয়সেই ত্যাগধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন সংস্কৃত সাহিত্যে তার উলেখ নেই বললেই চলে। প্রকৃত পক্ষে ভারতীয় পন্ডিত ও সমাজপতিগণ যৌবনে উচ্ছৃখলতাকেই দেখেছেন এবং তাই তারা আমাদের বালক বয়সের পর একেবারে বার্ধক্যে পৌছানোর পরামর্শ দিয়েছেন। এটা মূলত যৌবনকে পরিহার করার অভিমত।

কিন্তু এই ধরনের অভিমত কেন প্রদত্ত হলো? আসলে দেহের অনিত্যতা সঠিকভাবে উপলব্ধি করা হয় নি। প্রাচীন গুহাবাসী সন্ন্যাসী থেকে দেহভোগী পর্যন্ত সবাই যৌবনের উপর বীতশ্রদ্ধ। কারণ তারা রক্তমাংসের দেহের মধ্যেই যৌবনের অবস্থান কল্পনা করেছেন। প্রমথ চৌধুরী এই দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে বক্তব্য তুলে ধরে বলেছেন যে, প্রাচীন পন্ডিতগণ দেহ ও মনের পার্থক্য শনাক্ত করতে পারেন নি। মানুষের যৌবনে বাহ্যেন্দ্রিয়চেতনা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অন্তরিন্দ্রিয়চেতনাও বিকশিত হয়। এই অন্তরে বা প্রাণে যৌবনের সঞ্চার ঘটাতে পারলেই তা মানুষের জীবনকাল অবধি স্থায়ী হতে পারে। এই প্রাণের যৌবন বা মানসিক যৌবন রক্তমাংসনির্ভর স্বল্পস্থায়ী কিছু নয়। একের মন থেকে বহুজনের মনে তা সংক্রমিত করা সম্ভব। প্রমথ চৌধুরী বলেছেন, 'একের দেহের যৌবন অপরের দেহে প্রবেশ করিয়ে দেবার জো নেই; কিন্তু একের মনের যৌবন লক্ষ লোকের মনে সংক্রমণ করে দেওয়া যেতে পারে।' সমাজে যেহেতু লক্ষ্য মানুষের বাস, সেহেতু এভাবেই সমাজে যৌবনের প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

প্রমথ চৌধুরী মনে করেন সমাজদেহে মানসিক যৌবন প্রতিষ্ঠা করা অবশ্য উচিত। কারণ যৌবন মানবজীবনের পূর্ণ অভিব্যক্তি এবং মনুষ্যত্ব বিকাশের শ্রেষ্ঠ সময়। এই যৌবনকে শুধু রক্তমাংসের দেহের সীমায় যদি আবদ্ধ রাখা হয় তবে তা গন্ডিবদ্ধ হয়ে পড়ে। প্রাচীনকালে যৌবনের একমুখী চর্চা হয়েছে বলে পরবর্তীকালে পন্ডিতগণ আমাদের যৌবনকে গুপ্ত রাখার পরামর্শ দিয়েছেন। এতে গুপ্ত যৌবনের দুষ্ট প্রকাশ ঘটেছে। ভোগের ন্যায় ত্যাগও যেহেতু যৌবনের ধর্ম, সেহেতু যৌবনে শুধু একটি দিকই চর্চিত হতে পারে না। বাহ্যেন্দ্রিয়ের পাশাপাশি অন্তরিন্দ্রিয়ে যৌবধর্মের অনুশীলন হলে মানুষের মধ্যে সংবেদনশীলতা ও মনুষ্যত্ব অধিক জাগ্রত হবে। মানসিক যৌবন কোন নির্দিষ্ট বয়সে আবদ্ধ থাকে না এবং তা বহুর মধ্যে সংক্রমণযোগ্য। সমাজের বৃহত্তর বৃত্তে মানুষ আবদ্ধ বিধায় সামাজিক বহু মানুষের মানসিক যৌবন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজও যৌবনধর্ম প্রাপ্ত হয়। সমাজের এই যৌবন দেহের যৌবনের চেয়ে অনেক বেশি স্থায়ী। প্রমথ চৌধুরী একারণেই সমাজদেহে যৌবন সংক্রমণের কথা বলেছেন।

**পাঠ-৪.১**

# সংস্কৃতি-কথা

**মোতাহের হোসেন চৌধুরী**
**(১৯০৩-১৯৫৬)**

## উদ্দেশ্য

## এই পাঠ শেষে আপনি—

- সংস্কৃতির স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ধর্মের সঙ্গে সংস্কৃতির পার্থক্য নির্দেশ করতে পারবেন;
- মতবাদিদের সঙ্গে সংস্কৃতিবান মানুষের পার্থক্য কোথায় তা চিহ্নিত করতে পারবেন।

## ভূমিকা

মোতাহের হোসেন চৌধুরীর 'সংস্কৃতি-কথা' প্রবন্ধটিতে প্রবন্ধকারের সংস্কৃতি সম্বন্ধীয় চিন্তা-ভাবনা যুক্তি ও তর্কের ভেতর দিয়ে মুক্তবুদ্ধির আলোকে প্রকাশিত। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় 'সাহিত্য-সমাজ' নামে যে প্রতিষ্ঠানটি 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলো মোতাহের হোসেন চৌধুরী ছিলেন তার সঙ্গে সংশিষ্ট। তাঁর সংস্কৃতি চিন্তার মূলেও রয়েছে মূলত মুক্তবুদ্ধির আহ্বান। জ্ঞানের আড়ষ্টতা ও বুদ্ধির সীমাবদ্ধতা থেকে বৌদ্ধিকমুক্তির প্রত্যাশা ব্যক্ত মোতাহের হোসেন চৌধুরীর প্রবন্ধে।

## লেখক পরিচিতি

মোতাহের হোসেন চৌধুরী ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দে কুমিল্লায় মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ এবং ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ সেপ্টেম্বর মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর পৈত্রিক নিবাস ছিলো নোয়াখালি জেলার কাঞ্চনপুর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে এম.এ. পাশ করে অধ্যাপনায় যোগ দেন। তিনি ছিলেন সুরুচিসম্পন্ন, সংস্কৃতিবান, উদার, যুক্তিবাদী মানুষ। ঢাকার 'সাহিত্য-সমাজ' (১৯২৬) প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে ছিলো তাঁর গভীর যোগাযোগ। তিনি মূলত প্রাবন্ধিক হিসেবেই খ্যাত।

প্রথম জীবনে কবিতা লেখার কারণে বন্ধু ও পরিচিতমহলে 'কবি' হিসেবে তাঁর পরিচিতি ছিলো। পরবর্তীকালে কবিতা লেখা ত্যাগ করে বাংলা ভাষায় যুক্তিশিষ্ঠ ও মুক্তবুদ্ধি-দীপ্ত প্রবন্ধ রচনায় তিনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর গদ্যে একটি বিশিষ্টতা আছে। সরল ও আকর্ষণীয় গতিশীল গদ্য তিনি রচনা করেছেন। কৃত্রিম আড়ষ্টতা নয়, বরং অনুপলব্ধ চিন্তাকে রসসমৃদ্ধ করে পরিবেশনের পক্ষপাতী ছিলেন তিনি। শিল্পীর একাগ্রতা ও অধ্যবসায়ে তিনি তাঁর ভাষা ও রচনাশৈলী গড়ে তুলেছেন। জীবনদর্শনে তিনি ছিলেন বার্ট্রান্ড রাসেল (১৮৭২-১৯৭০) ও ক্লাইভ বেল (১৮৮১-১৯৬৪)-এর ভাবানুসারী। স্বাধীন ও মুক্ত ব্যক্তিত্বের বিকাশ তাঁর অন্বিষ্ট ছিলো, কিন্তু তা তিনি করতে চেয়েছেন সামাজিক অনুষঙ্গকে সংস্কারের মাধ্যমে। বুদ্ধির মুক্তির পথ ধরে তিনি যাত্রা করলেও হৃদয়ধর্মকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছেন। মোতাহের হোসেন চৌধুরীর সংস্কৃতি-সাধনার গভীরে এ বোধই কার্যকর। জীবদ্দশায় তাঁর কোনো গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। মৃত্যুর পর ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর একমাত্র বাংলা প্রবন্ধগ্রন্থ **'সংস্কৃতি-কথা'** প্রকাশিত হয়। এছাড়া প্রকাশ পায় ক্লাইভ বেলের Civilization -এর অনুবাদ **'সভ্যতা'** (১৯৬৫) ও 'Conquest of Happiness'-এর অনুবাদ **'সুখ'** (১৯৬৮)।

## পাঠ-পরিচিতি

মোতাহের হোসেন চৌধুরীর একমাত্র প্রবন্ধগ্রন্থ 'সংস্কৃতি-কথা' (১৯৫৮) থেকে 'সংস্কৃতি-কথা' প্রবন্ধটি সংকলিত হয়েছে। এই প্রবন্ধে প্রবন্ধকারের সংস্কৃতি সম্বন্ধীয় ভাবনা যৌক্তিক যুক্তির পারম্পর্যে ও তর্কের ভিতর দিয়ে প্রকাশিত। মুক্তবুদ্ধির যে আন্দোলন তাঁরা শুরু করেছিলেন, এ প্রবন্ধেও তার প্রভাব কার্যকর। বিষয় ও শিল্পরীতিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে সাহিত্য শিল্পের নামকরণ করা হয়ে থাকে। বর্তমান প্রবন্ধের নামকরণের ক্ষেত্রে সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়েছে। কারণ এখানে সংস্কৃতির মৌল উপাদান চিহ্নিতকরণের সঙ্গে সঙ্গে মানব জীবনে এর প্রভাব বিস্তার সম্পর্কে উলেখ আছে। প্রবন্ধটির মূল বিষয় নিয়ে আলোচনা করলেই এর নামকরণ যথার্থ হয়েছে কিনা তা বুঝা যাবে।

'সংস্কৃতি' অভিধাটি বিশাল ও বহুমাত্রিক। এর সংজ্ঞা ও স্বরূপ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক কম হয়নি। বহু মণীষী এ নিয়ে গভীর ও পান্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন। মোতাহের হোসেন চৌধুরীও এ-প্রসঙ্গে নিজের অভিমত ব্যক্ত করেছেন বর্তমান প্রবন্ধে। তিনি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীচেতনা, মতবাদ-অন্ধত্ব ও ধর্মীয় অনুভূতির গন্ডিবদ্ধতা শনাক্ত করে সংস্কৃতির যথার্থ পরিচয় তুলে ধরেছেন। প্রবন্ধের প্রথম বাক্যটিতেই যেন প্রথাবিরোধী বিদ্রোহী এক বক্তব্য তিনি প্রদান করেন, 'ধর্ম সাধারণ লোকের কালচার, আর কালচার শিক্ষিত, মার্জিত লোকের ধর্ম।'

আসলে সংস্কৃতি হলো প্রেম, সৌন্দর্য ও মার্জিত জীবনবোধের পরিশীলিত সমন্বয়। মানুষের আত্মিক প্রশান্তির মূলে রয়েছে তার সুস্থ সংস্কৃতিচেতনা। অন্যায় ও কলুষতার সঙ্গে সংস্কৃতিবান মানুষ সহবাস করতে পারে না। মুক্ত বুদ্ধি, উদার মানবতাবোধ, মার্জিত শিক্ষা ও পরিশীলিত জীবনচর্চা যেখানে নিঃসংশয়ভাবে প্রকাশিত সেখানেই প্রকৃত সংস্কৃতির প্রজ্বলন। সাধারণ মানুষ এর সমন্বয় সহজে করতে পারে না। তাই ধর্মই হয়ে ওঠে তাদের কালচার। তারা ধর্মের পথে বিচরণ করে সংস্কৃতিবান হয়ে ওঠে। তবে ধর্ম পরমত সহিষ্ণু নয়, যেমন নয় কোন মতবাদ। মতবাদিগণ অন্যের মতকে সহ্য বা স্বীকার করতে চায় না। কিন্তু সংস্কৃতি তা নয়। সংস্কৃতি হলো সত্য, সুন্দর আর আনন্দের পথে ধাবমানতা অন্যের মত ও পথকে অবহেলা না করেই এই অকৃত্রিম অনুভব লাভ করেন সংস্কৃতিবান মানুষ। কল্যাণ ও সাম্যকে সংস্কৃতি স্বীকার করে, সেই সঙ্গে চিন্তার স্বাতন্ত্র্যকেও গুরুত্ব দেয়। কূপএন্ডুকতা থেকে মুক্তি দিয়ে সংস্কৃতি মানুষকে উদার, সহনশীল, ও মানবতাবাদী করে তোলে। সে পৃথিবীতে স্বর্গীয় সুখ ও আনন্দ লাভ করতে প্রয়াসী হয় বলেই পারলৌকিক স্বর্গে তার আস্থা কমে আসে। সব মানুষের মধ্যে আত্মিক বন্ধন অন্বেষাই একজন সংস্কৃতিবান মানুষের কাছে প্রধান হয়ে ওঠে।

# মূলপাঠ

ধর্ম সাধারণ লোকের কালচার, আর কালচার শিক্ষিত, মার্জিত লোকের ধর্ম। কালচার মানে উন্নততর জীবন সম্বন্ধে চেতনা — সৌন্দর্য, আনন্দ ও প্রেম সম্বন্ধে অবহিতি। সাধারণ লোকেরা ধর্মের মারফতেই তা পেয়ে থাকে। তাই তাদের ধর্ম থেকে বঞ্চিত করা আর কালচার থেকে বঞ্চিত করা এক কথা।

ধর্ম মানে জীবনের নিয়ন্ত্রণ। মার্জিত আলোকপ্রাপ্তরা কাল্‌চারের মারফতেই নিজেদের নিয়ন্ত্রিত করে। বাইরের আদেশ নয়, ভেতরের সূক্ষ্মচেতনাই তাদের চালক, তাই তাদের জন্য ধর্মের ততটা দরকার হয় না। বরং তাদের উপর ধর্ম তথা বাইরের নীতি চাপাতে গেলে ক্ষতি হয়। কেননা তাতে তাদের সূক্ষ্ম চেতনাটি নষ্ট হয়ে যায়, আর সূক্ষ্মচেতনার অপর নাম আত্মা।

সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত কাল্‌চারের উদ্দেশ্য নয় — উপায়। উদ্দেশ্য, নিজের ভেতরে একটা ঈশ্বর বা আলাহ সৃষ্টি করা। যে তা করতে পেরেছে সে-ই কাল্‌চার্ড অভিধা পেতে পারে, অপরে নয়। বাইরের ধর্মকে যারা গ্রহণ করে তারা আলাকে জীবনপ্রেরণা রূপে পায় না, ঠোঁটের বুলি রূপে পায়। তাই শ'র উক্তি: Beware of the man whose God is in the skies — আলা যার আকাশে তার সম্বন্ধে সাবধান। কেন না, তারদ্বারা যে কোন অন্যায় ও নিষ্ঠুর কাজ হতে পারে। আলাকে সে স্মরণ করে ইহলোকে মজাসে জীবন যাপন করবার জন্য আর পরকালে দোজখের আজাব থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে, অথবা স্বর্গে একটা প্রথম শ্রেণীর সিট্ রিজার্ভ করার আগ্রহে — অন্য কোন মহৎ উদ্দেশ্যে নয়। ইহকালে ও পরকালে সর্বত্রই একটা ইতর লোভ।

অপর দিকে কাল্‌চার্ড লোকেরা সব চেয়ে বেশী ঘৃণা করে অন্যায় আর নিষ্ঠুরতাকে; অন্যায় নিষ্ঠুরতাকে তো বটেই, ন্যায় নিষ্ঠুরতাকেও। মানুষকে ন্যায়সঙ্গত ভাবে শাস্তি দিতেও তাদের বুক কাঁপে। নিষ্ঠুর হয়ো না — এই তাদের ভেতরের দেবতার হুকুম আর সে হুকুম তারা তামিল না করে পারে না, কেন না নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। তাই একটা ব্যক্তিগত জীবন-দর্শন বা স্বধর্ম সৃষ্টি করা কাল্‌চারের উদ্দেশ্য। যেখানে তা নেই সেখানে আর যাই থাক্ কাল্‌চার নেই। কাল্‌চার একটা ব্যক্তিগত ধর্ম। ব্যক্তির ভেতরের 'আমি'কে সুন্দর করে তোলাই তার কাজ।

কাল্‌চার সমাজতান্ত্রিক নয়, ব্যক্তিতান্ত্রিক। নিজেকে বাঁচাও, নিজেকে মহান করো, সুন্দর করো, বিচিত্র করো এ-ই কাল্‌চারের আদেশ। এবং এই আদেশের সফলতার দিকে নজর রেখেই তা সমাজ-তন্ত্রের সমর্থক। সমাজতন্ত্র তার কাছে লক্ষ্য নয়, উপলক্ষ। কাল্‌চার ব্যক্তিতান্ত্রিক এ কথা বল্‌লে এ বুঝায় না যে, কাল্‌চার্ড মানুষ সমাজের ধার ধারে না, সে দলছাড়া, গোত্রছাড়া জীব। তা নয়, সমাজের ধার সে খুবই ধারে। নইলে প্রাণ পাবে কোত্থেকে? ব্যক্তি তো নদী, সমাজ সমুদ্র। সমুদ্রের সঙ্গে যোগ-যুক্ত না হলে সে বাঁচবে কী উপায়ে? সুতরাং নিজের স্বার্থের দিকে নজর রেখেই কাল্‌চার্ড মানুষ সমাজের কথা ভাবে, এমন কি দরকার হলে সমাজের জন্য প্রাণ পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত থাকে। সংস্কৃতিবান মানুষ ব্যক্তিতান্ত্রিক এই অর্থে যে, সমাজ বা অর্থনীতির কথা ভেবে সে নিজের অসৌন্দর্যকে ক্ষমা করে না। এই সমাজে, এই অর্থনীতির

অধীনে এর চেয়ে বেশী সুন্দর হওয়া যায় না, এ কথা বলে নিজেকে কি অপরকে সান্ত্বনা দিতে সে লজ্জাবোধ করে। সে চায় নিজের সৌন্দর্যবোধের সম্পূর্ণ উন্মোচন, নিজের প্রতিভার সম্পূর্ণ বিকাশ। নিজের কাছ থেকে ষোল আনা আদায় করে না নিতে পারলে সে খুশী হয় না। এই জন্য শুধু সমাজের দিকে তাকিয়ে নিজেকে প্রকাশ করা তার মনঃপূত নয়। কেননা তাতে জীবনের গভীরতর স্তরের ধ্যানকল্পনার সম্পূর্ণ প্রকাশ ব্যাহত হয়, এবং নিভৃতবাসী অন্তর-পুরুষের সাক্ষাৎকার সম্ভব হয় না। জীবনের শ্রেষ্ঠ ও বহুভঙ্গিম প্রকাশ নিজের দিকে তাকিয়েই হয়, সমাজের দিকে তাকিয়ে নয়। অত্যধিক সমাজচেতনা মানুষকে একপেশে ও প্রমাণ-সাইজ করে রাখে — মানুষের চূড়ান্ত বৃদ্ধিতে অন্তরায় ঘটায়। সমাজের আদেশ: দশের মধ্যে এক হও, এগারো হয়ো না। এগারোদের সে সহ্য করে না — যদিও গৌরবের জন্য মাঝে মাঝে মাথায় করে নাচে। কাল্‌চারের আদেশ: দশের মধ্যে এগারো হও, দশের মধ্যে থেকেই নিজেকে নিজের মতো করে, সর্বাঙ্গ সুন্দর করে ফুটিয়ে তোল। তাতেই হবে তোমারদ্বারা সমাজের শ্রেষ্ঠ সেবা, যদিও সমাজের বিরক্তি-ভাজন হওয়াই হবে তোমার ভাগ্য।

সমাজ সাধারণভাবে মানুষকে সৃষ্টি করে, মানুষ আবার নিজেকে গড়ে তোলে শিক্ষাদীক্ষা ও সৌন্দর্যসাধনার সহায়তায়। এই যে নিজেকে বিশেষভাবে গড়ে তোলা এরি নাম কাল্‌চার। তাই কাল্‌চার্ড মানুষ স্বতন্ত্র-সত্তা, আলাদা মানুষ। নিজের চিন্তা, নিজের ভাবনা, নিজের কল্পনার বিকাশ না হলে কাল্‌চার্ড হওয়া যায় না। চিন্তা বা বিশ্বাসের ব্যাপারে সমতা স্থাপন করে মানুষের স্বাতন্ত্র্য লুপ্ত করতে চায় বলে ধর্ম অনেক সময়ে কাল্‌চারের পরিপন্থী। মতবাদীও এ দোষে দোষী, তাই মতবাদী ও ধার্মিকের মধ্যে একটা সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। উভয়েই সরকারী গলায় কথা বলে ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যের উপরে ষ্টীমরোলার চালাতে ভালোবাসে।

ধর্মের মতো মতবাদও মনের জগতে লেফট্-রাইট্ করতে শেখায়। ধার্মিকের জীবন নিয়ন্ত্রণ করে ভয় আর পুরস্কারের লোভ। সংস্কৃতিবান মানুষের জীবনে ও-সবের বালাই নেই। তারা সব কিছু করে ভালোবাসার তাগিদে। সত্যকে ভালোবাসা, সৌন্দর্যকে ভালোবাসা, ভালোবাসাকে ভালোবাসা — বিনা লাভের আশায় ভালোবাসা, নিজের ক্ষতি স্বীকার করে ভালোবাসা — এরি নাম সংস্কৃতি। তাই ধার্মিকের পুরস্কারটি যেখানে বহুদূরে থাকে, সংস্কৃতিবান মানুষ সেখানে তার পুরস্কারটি পায় হাতে হাতে, কেননা, কাজটি তার ভালোবাসার অভিব্যক্তি বলে তার আনন্দ, আর আনন্দই তার পুরস্কার। সে তার নিজের স্বর্গটি নিজেই সৃষ্টি করে নেয়। বাইরের স্বর্গের জন্য তাকে হা করে তাকিয়ে থাকতে হয় না।

পরম বেদনায়, অসংখ্য দুঃখের কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে সে অন্তরে যে গোলাপ ফুটিয়ে তোলে তাই তার স্বর্গ। সেই সৃষ্টি করা এবং তা অপরের সঙ্গে ভাগ করে ভোগ করা, এ-ই কাল্‌চার্ড জীবনের উদ্দেশ্য। এই স্বর্গ যখন অন্তরে জাগে তখন বাইরেও তার প্রভাব উপলব্ধ হয়। তখন স্বতঃই বলতে ইচ্ছে হয়:

স্বর্গ আমার জন্ম নিল মাটির মায়ের কোলে
বাতাসে সেই খবর ছোটে আনন্দ কলোলে।

ধর্ম চায় মানুষকে পাপ থেকে, পতন থেকে রক্ষা করতে, মানুষকে বিকশিত করতে নয়। জীবনের গোলাপ ফোটানোর দিকে তার নজর নেই, বৃক্ষটিকে নিষ্কণ্টক রাখাই তার উদ্দেশ্য। অপর পক্ষে কাল্‌চারের উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবনের বিকাশ, পতন পাপ থেকে রক্ষা নয়। গোলাপের সঙ্গে যদি দু-একটা কাঁটা এসেই যায় তো আসুক না, তাতে ক্ষতি নেই, দেখতে হবে শুধু ফুল ফুটল কিনা — এ-ই কাল্‌চারের অভিমত। মনুষ্যত্বের বিকাশই সব চেয়ে বড় কথা, চলার পথে যে স্খলন-পতন তা থেকে রক্ষা পাওয়াটাই বড় কথা নয়। বরং বড়জীবনের তাগিদে এসে এই স্খলন-পতনের মর্যাদাও বেড়ে যায় অনেকখানি।

◆ ◆

## শব্দার্থ ও টীকা

**কালচার —** ইংরেজি শব্দ (Culture)। বাংলা অর্থ 'সংস্কৃতি' বা 'কৃষ্টি'। জীবনে চর্চিত অনুশীলনলব্ধ রীতি-নীতি বা আচার-আচরণ এবং বিদ্যাবুদ্ধি। উন্নত রুচিবোধ, শিল্পস্পৃহা, মানসিক ও বৌদ্ধিক বিকাশ এই কালচারের অঙ্গীভূত।
**মার্জিত আলোকপ্রাপ্তরা —** সুশিক্ষার ফলে উৎকর্ষপ্রাপ্ত বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ।

**সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত কাল্‌চারের উদ্দেশ্য নয়, উপায় —** 'উদ্দেশ্য' শব্দের অর্থ 'লক্ষ্য' বা 'অভিপ্রেত' বা 'উদ্দেশ করা হয় এমন' কিছু। আর 'উপায়' শব্দের অর্থ 'অভীষ্টলাভের বা কার্যসাধনের পন্থা বা প্রণালী'। এখানে বলা হয়েছে যে, সাহিত্য, শিল্প বা সঙ্গীত চর্চা ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষ যাপিত জীবনে প্রকৃত সংস্কৃতিমান হয়ে ওঠে। এর অর্থ এই নয় যে, সাহিত্য বা সঙ্গীতচর্চা মানেই সংস্কৃতি।

**কাল্‌চার্ড** — অর্থাৎ সংস্কৃতিমান। সংস্কৃতিতে যিনি একাত্ম হয়েছেন।
**অভিধা** — নাম, সংজ্ঞা, উপাধি।
**স্বর্গে একটি প্রথম শ্রেণীর সিট্ রিজার্ভ করা** — পরকালে প্রশান্তিতে থাকার নিশ্চয়তা। ধর্ম বিশ্বাসীগণ মৃত্যুর পর সুখে শান্তিতে থাকতে চান। এখানে প্রবন্ধকার 'সিট্ রিজার্ভ' কথাটি ব্যঙ্গাত্মকভাবে ব্যবহার করেছেন। অনেকে মনে করেন যে, শুধু সৃষ্টিকর্তার প্রার্থনার মধ্যেই ইহজাগতিক সুখভোগ ও পারলৌকিক প্রশান্তি প্রাপ্তি সম্ভব। পরলোকে নিজের জন্যে একটি সর্বসুখপ্রদায়ী চিরস্থায়ী আসন নিশ্চিত করতে তাদের এ ধরনের প্রার্থনায় অবতীর্ণ হওয়ার মধ্যে মহত্ত্বের চেয়ে স্বার্থসিদ্ধির মনোবাসনাই লেখক আবিষ্কার করেছেন।
**ইতর লোভ** — 'লোভ' একটি খারাপ প্রবৃত্তি। 'ইতর' বিশেষণ ব্যবহার করে এই প্রবৃত্তির নেতিবাচকতা অধিকতর সুস্পষ্ট করা হয়েছে। নীচ বিষয়তৃষ্ণা বা সব কিছু আত্মসাৎ করার প্রবৃত্তি।
**ন্যায় নিষ্ঠুরতা** — 'নিষ্ঠুরতা' অর্থ 'নির্দয়তা'। ন্যায়ভাবেও এই নির্দয়তার বহিঃপ্রকাশ ঘটতে পারে। যেমন, হত্যাকারীর শাস্তি মৃত্যুদন্ড। — এখানে মৃত্যুদন্ড কার্যকর সামাজিকভাবে ন্যায়পথে নিষ্ঠুরতা প্রকাশ।
**তামিল** — পালন।
**ব্যক্তিগত ধর্ম** — একান্ত নিজের জীবন-দর্শন।
**সমাজতান্ত্রিক** — একটি রাজনৈতিক মতবাদ। এই মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্রের সমস্ত সম্পদের মালিক জনগণ। কিন্তু প্রবন্ধে 'সমাজতান্ত্রিক' শব্দটির ব্যবহার 'সমাজ ভিত্তিক' বা 'সমাজ নির্ভর' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।
**ব্যক্তিতান্ত্রিক** — এই শব্দটিও 'ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য' অর্থে ব্যবহৃত; কোন মতবাদ প্রকাশক নয়।
**দশের মধ্যে এক হওয়া** — গতানুগতিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা। যা প্রচলিত ও বহুকাল ধরে চর্চিত তার বাইরে না যাওয়া।
**স্বতন্ত্র-সত্তা** — অন্যদের থেকে পৃথক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়া।
**মনের জগতে লেফট্-রাইট্** — তত্ত্ব বা কতিপয় নিয়মের অনুসারী হয়ে মনের জগতকে সুনির্দিষ্ট ও গন্ডিবদ্ধ করে ফেলা।

**বস্তু-সংক্ষেপ**

শিক্ষিত ও মার্জিতরুচির ব্যক্তির সঙ্গে সাধারণ মানুষের চিন্তা-চেতনার প্রধান পার্থক্য হলো, কালচার যেখানে শিক্ষিত লোকের ধর্ম, সেখানে ধর্মই সাধারণ মানুষের কালচার। শিক্ষিত ব্যক্তি সৌন্দর্য, প্রেম, জ্ঞান ইত্যাদির সাধনা করে। সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীতের মতো উপায়ের মাধ্যমে মানুষ নিজেকে কালচার্ড করে তোলে। কালচার্ড ব্যক্তি আত্মার আনন্দের লক্ষ্যে মানুষ্যত্ব ও মূল্যবোধ দ্বারা পরিচালিত হয়। কিন্তু ধার্মিক ব্যক্তি পরলোকে সুখ সুনিশ্চিত করতে অথবা শাস্তির ভয়ে ধর্ম চর্চা করেন। কালচার্ড ব্যক্তির কাছে নিষ্ঠুরতা মাত্রই পরিত্যাজ্য, এবং তা যদি ন্যায় নিষ্ঠুরতা হয়, তবুও। কালচার বা সংস্কৃতির মূল কথাই হচ্ছে ব্যক্তিসত্তার বিকাশ। এই বিকাশটি স্বাতন্ত্র্য নিয়ে প্রকাশিত হয়। সমাজের অন্যদের সঙ্গে এর সম্পর্ক সামান্যই। কেননা, কালচারের মূল বৈশিষ্ট্য সৌন্দর্যবোধ, প্রেম, সত্য, মহত্ত্ববোধ ইত্যাদি ব্যক্তিভেদে পার্থক্য হতে বাধ্য। কালচার্ড বা সংস্কৃতিমান মানুষ সমাজের প্রথাবদ্ধতা অতিক্রম করতে প্রয়াসী হন; কিন্তু সমাজ তাকে পারিপার্শ্বের আর দশজনের মধ্যেই আটকে রাখতে চায়। ধার্মিকেরা সমাজের প্রচলিত বিধিবদ্ধতা আরও কঠিন করতে চান। কোন নির্দিষ্ট মতবাদের অনুসারীরাও ধার্মিকদের মতোই নির্দিষ্টতায় আবর্তিত হয়। ধর্ম ও মতবাদ মানুষের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে চায়, কিন্তু কালচার তা করে না। কালচার বা সংস্কৃতি মানুষকে নিজের মতো মুক্ত চিন্তা করতে অনুপ্রেরণা ও স্বাধীনতা দেয়। ধর্ম মানুষকে স্বর্গের লোভ ও নরকের ভয় দেখিয়ে নির্দিষ্ট পথে রাখতে চায়। কিন্তু সংস্কৃতি বা কালচার কোন ভয় বা লোভ দেখায় না, মনুষ্যত্ব বিকাশ ও আনন্দ এর একমাত্র লক্ষ্য।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন

**সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের উত্তর লিখুন**

১. 'সংস্কৃতি' কি?
২. ধর্মের সঙ্গে সংস্কৃতির পার্থক্য কোথায়?
৩. 'স্বর্গে একটি প্রথম শ্রেণীর সিট্ রিজার্ভ করা' — বলতে প্রবন্ধকার কি বুঝিয়েছেন?
৪. ধার্মিক ও মতবাদীদের সঙ্গে সংস্কৃতিবান মানুষের পার্থক্য কোথায়?

**৪ নং সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের নমুনা-উত্তর**

ধর্ম যেমন মানুষকে কতিপয় নিয়ম ও প্রথায় আবদ্ধ করে ফেলে, তেমনি মতবাদও মানুষের জন্যে নির্দিষ্ট গন্ডি বেঁধে দেয়। ধার্মিক ও মতবাদীরা নিজেদের অনুসৃত পথ ছাড়া অন্য সবকিছুকে ভ্রান্ত মনে করে। এ কারণে নিজের সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী ছাড়া অন্যদের উপর তারা অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে। ধার্মিক এই নিষ্ঠুরতা করে ধর্মগ্রন্থের সমর্থনে, আর মতবাদীরা সাহায্য নেয় বিজ্ঞানের। কিন্তু সংস্কৃতি পরের মতের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে শেখায়। সংস্কৃতিতে যেহেতু জ্ঞানেন্দ্রিয়ের চর্চা হয় বেশি, সেহেতু সংস্কৃতিবান মানুষ সত্যদর্শন ও যৌক্তিক যুক্তির পারম্পর্যে প্রেমময় দৃষ্টিতে বিচার করে সব কিছু। তার কাছে অন্যায় নিষ্ঠুরতার মতো ন্যায় নিষ্ঠুরতাও অবশ্য পরিত্যাজ্য। ধার্মিক ও মতবাদীরা যেখানে বাইরে থেকে বেঁধে দেয়া দর্শন গ্রহণ করে, সংস্কৃতিবান সেখানে বহু নিষ্ঠায় নিজের ভেতর থেকে একটা জীবনদর্শনের জন্ম দেয় — এখানেই হচ্ছে মূল পার্থক্য।

**প্রসঙ্গ উলেখ করে ব্যাখ্যা লিখুন**

১. ধর্ম সাধারণ লোকের কালচার, আর কালচার শিক্ষিত মার্জিত লোকের ধর্ম।
২. সাহিত্য শিল্প সঙ্গীত কালচারের উদ্দেশ্য নয় — উপায়। উদ্দেশ্য, নিজের ভেতরে একটা ঈশ্বর বা আলাহ্ সৃষ্টি করা।
৩. মতবাদীও এ দোষে দোষী, তাই মতবাদী ও ধার্মিকের মধ্যে একটা সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়।
৪. গোলাপের সঙ্গে যদি দুএকটা কাঁটা এসেই যায়, তো আসুক না, তাতে ক্ষতি নেই, দেখতে হবে শুধু ফুল ফুটল কিনা — এ-ই কালচারের অভিমত।

**২ নং ব্যাখ্যার নমুনা-উত্তরঃ**

ব্যাখ্যেয় অংশটুকু বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ মোতাহের হোসেন চৌধুরী রচিত 'সংস্কৃতি-কথা' নামক প্রবন্ধ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। এখানে সংস্কৃতির সঙ্গে সাহিত্য, শিল্প ও সঙ্গীতের আন্তঃসম্পর্ক কীভাবে ও কতটুকু সে সম্পর্কে প্রবন্ধকার মন্তব্য করেছেন।

কালচার বা সংস্কৃতি একটি অধরা প্রতীতি, যা অর্জন করতে হয়। সংস্কৃতি মানুষের রুচি উন্নত করে, বিবেককে করে জাগ্রত। এই উন্নত রুচি ও জাগ্রত বিবেকেরদ্বারা মানুষ সত্য, ন্যায়, জ্ঞান, প্রেম ও দয়াকে বরণ করে আর মিথ্যা অন্যায়, অজ্ঞান ও হিংসাকে ঘৃণা করে। এতে মানুষের নিজের ভেতরে একটি নৈতিক অবস্থান সৃষ্টি হয় — যারদ্বারা সে নিজে পরিচালিত হতে পারে। এটাই 'ঈশ্বর বা আলাহ্'র সৃষ্টি। এই ঈশ্বর বা আলাহ কোন আরোপিত বহিঃশক্তির প্রতিক্রিয়া নয়। সাহিত্য, শিল্প বা সঙ্গীত সাধনার মাধ্যমেও মানুষ রুচিকে উন্নত করতে পারে, জন্ম দিতে পারে নিজের মধ্যে দায় ও নীতিবোধের। তাই বলে কোন গ্রন্থের প্রণেতা কিংবা সঙ্গীতশিল্পীমাত্রই সংস্কৃতিবান মানুষ — এমন নাও হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, সংস্কৃতি হলো একটি মানবিক পরিবর্তন ; যা মানুষকে সুশীল ও উন্নততর জীবন গড়ার ইঙ্গিত দেয়। সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত মানুষকে এ-পথে এগিয়ে যেতে সহায়কের ভূমিকা পালন করতে পারে।

**পাঠ-৪.২**

## উদ্দেশ্য

## এ পাঠ শেষে আপনি—

- সংস্কৃতির সঙ্গে ইন্দ্রিয়সাধনার সম্পর্ক ও সংযোগ নির্দেশ করতে পারবেন।
- নারী সংস্কৃতির অপরিহার্য উপাদান কেন, তা বলতে পারবেন।
- মোতাহের হোসেন চৌধুরী 'সভ্যতা' বলতে কি বুঝিয়েছেন, তা ব্যক্ত করতে পারবেন।
- মানুষ সংস্কারমুক্ত হয় কিভাবে, সে-কথা প্রকাশ করতে পারবেন।

# মূলপাঠ

বিকাশকে বড় করে দেখেনা বলে ধর্ম সাধারণতঃ ইন্দ্রিয় সাধনার পরিপন্থী। অথচ ইন্দ্রিয়ের পঞ্চপ্রদীপ জ্বেলে জীবনসাধনারই অপর নাম কাল্‌চার। মন ও আত্মার সঙ্গে যোগযুক্ত করে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বকের নবজন্মদানই কাল্‌চারের উদ্দেশ্য। অবশ্য এই ইন্দ্রিয়নিচয়ের সবকটিই যে সমমূল্য তা নয়। ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যে চক্ষু আর কানই সেরা। তাই তাদের স্থান সকলের আগে দেওয়া হয়েছে। চোখের মানে ছবির সাধনা, কানের সাধনা গানের। (সাহিত্যের মধ্যে চোখ ও কান উভয়েরই কাজ রয়েছে, কেননা তা ছন্দ ও ছবি উভয়ের মিলন।) চোখ ও কানের পরেই নাসিকার স্থান — নিঃশ্বাস গ্রহণের সহায়তায় বাঁচবার সুযোগ দেয় বলে নয়, সুগন্ধ উপলব্ধিরদ্বারা আত্মাকে প্রফুল রাখবার সুযোগ দেয় বলে। চোখ ও কান 'আত্মার' জিহ্বা, এদের মারফতেই সে তার খাদ্য চয়ন করে। অথচ, ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়, কোন কোন ধর্ম এই চোখ ও কানের সাধনারই পরিপন্থী, সেখানে তারা পতনের ফাঁদ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় না। তাই আমরা চোখ থাকতেও কানা, কান থাকতেও কালা। সুর বা ছবির সূক্ষ্মতা আমাদের প্রাণে দাগ কাটে না। চোখ ও কানের প্রতি বেখেয়াল থাকা যে আত্মার প্রতিই বেখেয়াল থাকা, সংস্কৃতিবানরা তা বুঝলেও ধার্মিকের মাথায় তা সহজে ঢোকে না। তাই তারা শুধু ঈশ্বরের নাম নেয়, ঐশ্বর্য উপলব্ধি করে না।

ইন্দ্রিয়ের সাধনা বলে কাল্‌চারের কেন্দ্র নারী। নারীর চোখ মুখ, স্নেহ-প্রীতি, শ্রী ও হ্রী নিয়েই কাল্‌চারের বাহন শিল্প-সাহিত্যের কারবার। ইন্দ্রিয়গ্রামের জাগরণ ও নিয়ন্ত্রণের মূলেও নারী। 'বোধকলি' তার প্রসাদেই ফোটে, জীবনের শক্তি, সাহস ও সাধনার প্রেরণা নারী থেকেই আসে। তাই কবির মুখে শুন্‌তে পাওয়া যায়, 'আমি হব না তাপস, হব না, হব না, যদি না পাই তপস্বিনী' জীবনে তপস্যা করতে চায় বলে নারী-সঙ্গ কাল্‌চার্ড মানুষের এতো কাম্য। বৈরাগীরা নারীকে পর করে সংস্কৃতিকেও পর করে। তাই তাদের জীবনে বৃদ্ধি নেই, তারা নিঃস্ব — নব-নব বুদ্ধি ও প্রীতির স্বাদ থেকে বঞ্চিত। কী মানসিক, কী সাংসারিক সর্বপ্রকার সমৃদ্ধির গোড়ায় নারী। যাত্রাপথে নারীর জয়ধ্বনিই পুরুষের জীবন-পথের শ্রেষ্ঠ পাথেয়। যে জাতি নারীকে সম্পূর্ণ রূপে আলাদা রাখতে চায় সে জাতি জীবনে মৃত্যুর আরাধনা করে — ইতিহাসের খাতায় সে মরা-জাতির পৃষ্ঠায় নাম লেখায়। তার জীবনে আত্ম-নির্যাতন আছে, আত্মনিয়ন্ত্রণ নেই। আর আত্মনিয়ন্ত্রণ নেই বলে সংস্কৃতিও নেই। কেন না সংস্কৃতি মানেই আত্মনিয়ন্ত্রণ — নিজের আইনে নিজেকে বাঁধা।

ধর্মের মধ্যে বৈরাগ্যের বীজ উপ্ত রয়েছে। কোন কোন ধর্ম নারীকে দেখেছে বিষের নজরে, আর কোন কোন ধর্ম ততটা না গেলেও সঙ্গীত-নৃত্যের মারফতে নারীকে ঘিরে যে ইন্দ্রজাল সৃষ্টি তাতে জানিয়েছে ঘোর আপত্তি। সঙ্গীত-নৃত্য ইত্যাদি তার কাছে কামেরই আয়োজন, কামের উন্নয়ন নয়। ফলে সূক্ষ্ম উপভোগের সহায় না হয়ে নারী স্থূল ভোগের বস্তু হয়েই রইল, নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধির প্রেরক ও উচ্চতর জীবনের সহায় হতে আর পারলে না। যৌন ব্যাপারে বিশেষ ও কড়া শাসনের ফলে মানুষ তাতেই আকৃষ্ট হয়ে রইল — যৌন সম্ভোগকে অতিক্রম করে যে প্রেম ও আনন্দ তা অনুভব করতে পারলে না বলে। নিষিদ্ধ বস্তু সাধারণত: ভীতি ও অতিরিক্ত আকর্ষণ — এই দুই মনোবৃত্তির সংঘর্ষ বাধিয়ে জীবনে বিকৃতি ঘটায়। এখানেও তাই হল, যৌন ব্যাপারে মন্দ, একথা না বলে যদি বলা হত প্রেম ভালো, আনন্দ ভালো, প্রেমের জন্য প্রতীক্ষা ভালো, আনন্দের জন্য প্রতীক্ষা ভালো, তা হলে পৃথিবীর চেহারা হয়তো এতো কদর্য হত না। প্রেমেরদ্বারা কাম নিয়ন্ত্রিত হ'ত বলে ব্যভিচার ও বিরোধ উভয়ের অত্যাচার থেকে মুক্তি পেয়ে মানুষ সহজ ও সুন্দর হতে পারত। কিন্তু তা না বলে নীতিবিদরা মানুষকে সংযম শিক্ষা করতে বললেন, অথচ কোন্ বড় জিনিসের দিকে তাকিয়ে তা করতে হবে তা বাত্‌লালেন না। কেবল স্বর্গের দিকে ইঙ্গিত করলেন। আর স্বর্গের যে চিত্রটি আঁকা হল তাতে, এখানে যা ভয়ঙ্কর বলে সাব্যস্ত, সেই ইন্দ্রিয় বিলাসেরই জয় জয়কার ঘোষিত হল। তাই ইন্দ্রিয়-ভীতি সত্ত্বেও মানুষ ইন্দ্রিয়-সর্বস্বতার দিকে ঝুঁকলে — মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলবার মতো বড় কিছুর আশ্রয় খুঁজে পেলে না। নীতিবিদদের জানা উচিত ছিল, সংযম বলে কোন স্বাস্থ্য-প্রদায়ী বস্তু নেই, আছে বড় জিনিষের জন্য প্রতীক্ষা আর সেই বড় জিনিষ হচ্ছে প্রেম। যে প্রেমে

পড়েছে, অথবা প্রেমের মূল্য উপলব্ধি করেছে সে-ই প্রতীক্ষা করতে শিখেছে, অর্থাৎ সে-ই সহজে সংযমী হতে শিখেছে, অপরের পক্ষে সংযম মানে পীড়ন আর পীড়ন নিষ্ঠুরতার জনয়িত্রী। যে বিনা কারণে নিজেকে দুঃখ দেয়, অপরকে দুঃখ দিতে তার তিলমাত্রও বাধে না। ঝধফরংস-এর গোড়ায় আত্মপীড়ন, একথা মনে রাখা চাই।

ধার্মিক আর কাল্‌চার্ড মানুষে আরেকটা লক্ষ্যযোগ্য পার্থক্য এই যে, ধার্মিকের চেয়ে কাল্‌চার্ড মানুষের বন্ধন অনেক বেশী। উল্টা কথার মতো শোনালেও, কথাটি সত্য। ধার্মিকের কয়েকটি মোটা বন্ধন, সংস্কৃতিবান মানুষের বন্ধনের অন্ত নেই। অসংখ্য সূক্ষ্মচিন্তার বাঁধনে যে বাঁধা সেই তো ফ্রি-থিংকার আর ফ্রি থিংকিং কাল্‌চারের দান। যেখানে ফ্রি থিংকিং নেই সেখানে কাল্‌চার নেই।

প্রশ্ন হবে: ধর্ম আর কাল্‌চারকে যেভাবে আলাদা করে দেখা হল তাতে মনে হচ্ছে নাকি ধার্মিক কখনো প্রকৃত অর্থে কাল্‌চার্ড হতে পারে না? কিন্তু কথাটি কি সত্য? ধার্মিকদের মধ্যেও তো অনেক কাল্‌চার্ড লোক দেখতে পাওয়া যায়। উত্তরে বলব : তা বটে, কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই টের পাওয়া যাবে, সেখানেও কাল্‌চারই কাল্‌চার্ড হওয়ার হেতু। অনুভূতি, কল্পনার সাধনা করেছেন বলেই তাঁরা কালচার্ড, অন্য কারণে নয়।

সংস্কৃতি মানে জীবনের Values [১] সম্বন্ধে ধারণা। ধর্মের মতো মতবাদ বা আদর্শও তা ধ্বংস করে দিতে পারে। তাই সে সম্বন্ধে সাবধান হওয়া দরকার। অতীতে ধর্ম ঈশ্বরকে আচ্ছন্ন করেছিল, বর্তমানে মতবাদ বা আদর্শ মনুষ্যত্বকে আচ্ছন্ন করতে পারে। লোকটা মোটের উপর ভালো কি মন্দ সেদিকে আমাদের নজর নেই, তার গায়ে কোন্ দলের মার্কা পড়েছে সেদিকেই আমাদের লক্ষ্য। মার্কাটি নিজের দলের হলে তার সাতখুন মাফ, না হলে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তার দোষ বের করা আমাদের স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। এই মনোবৃত্তি থেকে মুক্তি না পেলে কাল্‌চার্ড হওয়া যায় না। মনে রাখা দরকার, ধর্মের সমস্ত দোষ মতবাদের ঘাড়ে এসে চেপেছে। মতবাদী ধার্মিকের মতই অসহিষ্ণু ও সংকীর্ণ, ধার্মিকের মতোই দলবদ্ধতায় বিশ্বাসী, অধিকন্তু ধার্মিকের চেয়েও নিষ্ঠুর। ধার্মিকের নিষ্ঠুরতার সহায় ছিল ধর্মগ্রন্থের সমর্থন, মতবাদীর সহায় বিজ্ঞান। আমি আমার জন্য নিষ্ঠুর হচ্ছি না, পৃথিবী-উন্নয়নের বিজ্ঞানসম্মত আদর্শের জন্যই নিষ্ঠুর হচ্ছি। অতএব এখানে আমার গৌরব নিহিত, কলঙ্ক নয়। নিষ্ঠুরতা-ব্যাপারে এই যুক্তিই মতবাদীর আত্মসমর্থনের উপায়। সৌভাগ্যের বিষয় সত্যিকার সংস্কৃতিকামীরা কখনো মতবাদী হতে চায় না, মতবাদকে তারা যমের মত ভয় করে। কেননা তাদের কাজ বাইরের থেকে কোন দর্শন গ্রহণ করা নয়, বহু বেদনায় নিজের ভিতর থেকে একটা জীবনদর্শনের জন্ম দেওয়া, এবং দিনদিন তাকে উন্নতির পথে চালনা করা।

আইডিয়ার গোঁড়ামি থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র উপায় নিজের বা নিজের দলের অভ্রান্ততা সম্বন্ধে একটুখানি সন্দেহ রাখা। এই সন্দেহটুকুই

মানুষকে সুন্দর করে তোলে, আর সৌন্দর্যই সংস্কৃতির লক্ষ্য। স্কেপ্‌টিসিজমের প্রভাব না থাকলে যে সভ্যতা সৃষ্টি হতে পারে না, এতো এক রকম অবিসংবাদিত সত্য। মনে রাখা দরকার, সংস্কৃতিবান হওয়ার কোন ধরাবাঁধা পথ নেই, বিচিত্র পথ। কার জন্য কোন্ পথটি সার্থক কে বলবে? সেকালে বলা হত যত জীব, তত শিব; একালে বলা যেতে পারে যত সংস্কৃতিবান মানুষ তত সংস্কৃতি — পন্থা। যে-পথটি ধরে মানুষ কাল্‌চার্ড হয় তা অলক্ষ্য না হলেও দুর্লক্ষ্য। তা পরে আবিষ্কার করা যায়, আগে নয়। তাই সংস্কৃতিবান মানুষটি একটা আলাদা মানুষ, স্বতন্ত্র-সত্তা। তার জীবনের একটি আলাদা স্বাদ, আলাদা ব্যঞ্জনা থাকে। সে মতবাদীর মতো বুলি আওড়ায় না — তার প্রতিকথায় আত্মা স্পন্দিত হয়ে উঠে। প্রেমের ব্যাপারে, সৌন্দর্যের ব্যাপারে, এমন কি সাধারণতা-ধর্মী কল্যাণের ব্যাপারেও তার আত্মার ঝল্‌কানি দেখতে পাওয়া যায়। নিজের পথটি নিজেই তৈরি করে নেয় বলে সে নিজেই নিজের নবী হয়ে দাঁড়ায়। তাই সে স্বাতন্ত্র্যধর্মী, গোলে হরিবোলের জগতে তার নিশ্বাস বন্ধ আসে। কল্যাণের ব্যাপারে সাম্যকে স্বীকার করলেও প্রেমের ব্যাপারে, সৌন্দর্যের ব্যাপারে, চিন্তার ব্যাপারে সে স্বাতন্ত্র্য তথা বৈচিত্র্যের পক্ষপাতী। সত্যকার সংস্কৃতিকামীরা নিজেদের ছাঁচে ঢালাই করতে চায় না। নকল যীশু, নকল বুদ্ধ, নকল মার্কস বা নকল লেনিন হওয়া তাদের মনঃপূত নয়। ক্ষুদ্র হলেও তারা খাঁটি কিছু হতে চায়।

কিন্তু পথের বিভিন্নতা থাকলেও তাদের লক্ষ্যের সাম্য রয়েছে — সকলেই অমৃত তথা আত্মাকে চায়। যীশুখৃষ্ট যখন বলেন: For what is man profited if he shall gain the whole word, and lose his own soul ?— তখন সংস্কৃতিকামীর অন্তরের কথাই বলেন। এই খ্রিষ্টবাণীরই ঔপনিষদিক ভাবান্তর হচ্ছে 'যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম' — যা দিয়ে আমি অমৃত লাভ করবনা তা দিয়ে আমি কি করব? অমৃতকে কামনা, তথা প্রেমকে কামনা, সৌন্দর্যকে কামনা, উচ্চতর জীবনকে কামনা, এই তো সংস্কৃতি। এই জন্য সংস্কৃতিকে একটা আলাদা ধর্ম, উচ্চস্তরের ধর্ম বলা হয়েছে। প্রাণী-জীবনের ঊর্ধ্বে যে জীবন রয়েছে তার সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে দিয়ে, এবং তারদ্বারা প্রাণী-জীবনকে মন্ডিত করে দিয়ে, তা মানুষের অন্তরে মুক্তির স্বাদ নিয়ে আসে। তাই বলে প্রাণী-জীবনের তথা ক্ষুৎপিপাসার মূল্য যে তা

দেয় না তা নয়। খুবই দেয়। Man does not live by bread alone — এই কথাটার মধ্যেই ক্ষুৎপিপাসার স্বীকৃতি রয়েছে। তবে মর্যাদাভেদ আছে। যা নিয়ে বাঁচা যায়, আর যার জন্য বাঁচতে হয়, তা কখনো এক মর্যাদা পেতে পারে না। তাই সংস্কৃতিকামীদের ইচ্ছা: ক্ষুৎপিপাসার জগৎটি তৈরি করা হোক ক্ষুৎপিপাসার ঊর্ধ্বে যে জগৎটি রয়েছে তারি পানে লক্ষ্য রেখে। নইলে সংস্কৃতি ব্যাহত হবে। সংস্কৃতিকামীরা আরো কামনা করে: ক্ষুৎপিপাসার জগৎ তথা কল্যাণের জগৎ নির্মাণে লক্ষ্যের চেয়ে উপায়কে যেন কম বড় স্থান দেওয়া না হয়। কেননা উপায়ই চরিত্রের স্রষ্টা — লক্ষ্য নয়। একবার একরকম চরিত্র সৃষ্টি হয়ে গেলে পরে তার থেকে মুক্তি পাওয়া কঠিন। সাধারণ লোকের কাছে প্রগতি আর সভ্যতায় কোন পার্থক্য নেই। যা সভ্যতা তা-ই প্রগতি, অথবা যা প্রগতি তা-ই সভ্যতা। কিন্তু কাল্‌চার্ড লোকেরা তা স্বীকার করে না। উভয়ের সূক্ষ্ম পার্থক্য সম্বন্ধে তারা সচেতন। প্রগতি তাদের কাছে মোটের উপর জ্ঞানের ব্যাপার। কেননা জ্ঞানের ক্ষেত্রেই পরিবর্তনশীলতা অবধারিত, সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে নয়। তাই জ্ঞান, বিশেষ করে বিজ্ঞান আর বিজ্ঞানপ্রসূত কল্যাণকেই তারা প্রগতি মনে করে। প্রকৃতিবিজয়লব্ধ সমৃদ্ধির সার্থক বিতরণই তাদের কাছে প্রগতি। কিন্তু সভ্যতা শুধু প্রগতি নয়, আরো কিছু। প্রগতির সঙ্গে সৌন্দর্যের সম্বন্ধ, প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপিত না হলে সভ্যতা হয় না। আর সৌন্দর্য ও প্রেমের ব্যাপারটা তথা শিল্পের ব্যাপারটা — কেননা শিল্প, সৌন্দর্য ও প্রেমেরই অভিব্যক্তি — চিরন্তন ব্যাপার, প্রগতির ব্যাপার নয়। এ সম্বন্ধে গিল্‌বার্ট মারের উক্তিটি উলেখযোগ্য: Doubtless there is in every art an element of knowledge or science, and that element is progressive. But there is another element, too, which does not depend on knowledge and which does not progress but has a kind of stationary and eternal value, like the beauty of the dawn, or the love of a mother for her child, or the joy of a young animal in being alive, or the courage of a martyr facing torment. We cannot, for all our progress, get beyond these things; there they stand, like light upon the mountains. The only question is whether we can rise to them. And it is the same with all the greatest births of imagination. — চিরন্তনকে স্পর্শ করতে না পারলে সভ্যতা সৃষ্টি করা যায় না। কেননা সভ্যতা 'ভ্যালু'র ব্যাপার, আর 'নিউভ্যালু' ব'লে কোন চিজ নেই। জীবনে সোনা ফলাতে হলে প্রগতিকে চলতে হবে সভ্যতার দিকে মুখ করে, নইলে তার কাছ থেকে বড় কিছু পাওয়া যাবে না। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, আজকাল প্রগতি কথাটা যত্রতত্র শুনতে পাওয়া গেলেও সভ্যতা কথাটা এক রকম নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে। লোকেরা কেবল প্রগতি প্রগতি করে, সভ্যতার নামটিও কেউ মুখে আনে না।

অনেকে সংস্কারমুক্তিকেই সংস্কৃতি মনে করে, উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখতে পায় না। কিন্তু তা সত্য নয়। সংস্কারমুক্তি সংস্কৃতির একটি শর্ত মাত্র। তাও অনিবার্য শর্ত নয়। অনিবার্য শর্ত হচ্ছে মূল্যবোধ। সংস্কার-মুক্তি ছাড়াও সংস্কৃতি হতে পারে, কিন্তু মূল্যবোধ ছাড়া সংস্কৃতি অসম্ভব। মূল্যবোধহীন সংস্কারমুক্তির চেয়ে কুসংস্কারও ভালো। শিশ্নোদর-পরায়ণতার মতো মন্দ সংস্কার আর কি হতে পারে? অর্থগৃধ্নুতাও তাই — কিন্তু এসব মূল্যবোধহীন সংস্কারমুক্তিরই ফল। তাই শুধু সংস্কার-মুক্তির উপরে আস্থা স্থাপন করে থাকা যায় না। আরো কিছু দরকার। কামের চেয়ে প্রেম বড়, ভোগের চেয়ে উপভোগ, এ সংস্কার না জন্মালে সংস্কৃতি হয় না। সূক্ষ্ম জীবনের প্রতি টান সংস্কৃতির জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু মূল্যবোধহীন সংস্কারমুক্তির টান সে দিকে নয়, তা স্থূল জীবনেরই ভক্ত।

সংক্ষেপে সুন্দর করে, কবিতার মতো করে বলতে গেলে সংস্কৃতি মানে সুন্দরভাবে, বিচিত্রভাবে, মহৎ ভাবে বাঁচা; প্রকৃতি-সংসার ও মানব-সংসারের মধ্যে অসংখ্য অনুভূতির শিকড় চালিয়ে দিয়ে বিচিত্র রস টেনে নিয়ে বাঁচা; কাব্যপাঠের মারফতে ফুলের ফোটায়, নদীর ধাওয়ায়, চাঁদের চাওয়ায় বাঁচা; আকাশের নীলিমায়, তৃণগুল্মের শ্যামলিমায় বাঁচা, বিরহীর নয়নজলে, মহতের জীবনদানে বাঁচা; গত্মকাহিনীর মারফতে, নর-নারীর বিচিত্র সুখ-দুঃখে বাঁচা; ভ্রমণকাহিনীর মারফতে, বিচিত্র-দেশ ও বিচিত্র জাতির অন্তরঙ্গ সঙ্গী হয়ে বাঁচা; ইতিহাসের মারফতে মানব-সভ্যতার ক্রমবিকাশে বাঁচা; জীবনকাহিনীর মারফতে দুঃখীজনের দুঃখ নিবারণের অঙ্গীকারে বাঁচা। বাঁচা, বাঁচা, বাঁচা। প্রচুরভাবে, গভীরভাবে বাঁচা। বিশ্বের বুকে বুকে বুক মিলিয়ে বাঁচা।

সংস্কৃতিসাধনা মানে ৎরঢ়ব হওয়ার সাধনা। সে জন্য জ্ঞানের প্রয়োজন আছে, বিজ্ঞানের প্রয়োজন আছে, কিন্তু সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন প্রেমের। সংস্কৃতিবান হওয়ার মানে প্রেমবান হওয়া। প্রেমের তাগিদে বিচিত্রজীবনধারায় যেস্নাত হয়নি সে তো অসংস্কৃত। তার গায়ে প্রকৃত জীবনের কটুগন্ধ লেগে রয়েছে; তা অসহ্য। 'সবার পরশে-পবিত্র করা তীর্থ-নীরে', স্নাত না হলে সংস্কৃতিবান হওয়া যায় না।

◆ ◆

## শব্দার্থ ও টীকা

**ইন্দ্রিয় সাধনা—** যে সকল দেহ-যন্ত্র বা শক্তিদ্বারা বাহ্য বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান বা বিভিন্ন ক্রিয়াসম্পাদনে সামর্থ্য জন্মে তার সাধনা। ইন্দ্রিয় চৌদ্দটি। যথা: বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ — এই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় ; চক্ষু, কর্ণ, নাসা, জিহ্বা, ত্বক — এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়; মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত— এই চারটি অন্তরিন্দ্রয়।
**পঞ্চপ্রদীপ—** পাঁচটি মুখ বিশিষ্ট প্রদীপ। সাধারণত আরতি করতে ব্যবহৃত হয়।
**ইন্দ্রিয়ের পঞ্চপ্রদীপ জ্বেলে জীবনসাধনা—** চক্ষু কর্ণ নাসা জিহ্বা ত্বক এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের প্রত্যেকটিকে যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী হয়ে জীবন পরিচালনা।
**ঐশ্বর্য—** ঈশ্বরত্ব, প্রভুত্ব; যোগলব্ধ শক্তি, বিভূতি। শব্দটি গঠিত হয়েছে এভাবে — সং.ঈশ্বর+য (ভা)।
**শ্রী—** সৌন্দর্য, লাবণ্য, শোভা।
**হ্রী—** লজ্জা।
**তপস্বিনী—** যে নারী সংসার ত্যাগ করে (অরণ্যবাসী হয়ে) কঠোর নিয়মে দেবতার আরাধনা করেন।
**উন্মেষশালিনী—** উন্মীলনকারিণী, উদ্রেককারিণী।
**জনয়িত্রী—** জন্মদাত্রী, জননী, মাতা।
**Sadism—** ধর্ষকাম; নিষ্ঠুরতায় যে যৌন আনন্দলাভ হয়; Sexual delight in cruelty.
**স্কেপ্‌টিসিজম—** আত্মমুক্তির মতবাদ।
**শিশ্নোদর-পরায়ণ—** কামপ্রবৃত্তি ও উদরের তৃপ্তিই যার একমাত্র লক্ষ্য।
**অর্থগৃধ্নু—** অর্থলোভী।

## বস্তুসংক্ষেপ

জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মধ্যে মানুষের চোখ ও কান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সংস্কৃতি বা কালচার এই দুয়ের বিকাশ ঘটাতে চাইলেও ধর্ম তা অনুমোদন করে না। ধর্ম বরং সত্যদর্শন ও যুক্তি শ্রবণকে সংযমের কথা বলে বাধা দেয়। সংস্কৃতিবান মানুষ কিন্তু সত্যদর্শন ও যুক্তির আলোকে এগিয়ে যান। মানব সমাজের অর্ধাংশ নারীকে সংস্কৃতি অবজ্ঞা করতে চায় না। বরং নারী কালচারের অপরিহার্য উপাদান। কেননা, সুর ও সৌন্দর্যের অন্যতম উৎস হলো নারী। নারীতে কাম আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু কামের চেয়ে প্রেম, ভোগের চেয়ে উপভোগই সংস্কৃতিবান মানুষের কাছে অন্বিষ্ট। অথচ, নারীকে নরকেরস্নার হিসেবে চিহ্নিত করে ধর্ম। সমাজও মূল্যবোধ রক্ষার নামে নারীব্যক্তিত্ব বিকাশে বাধার সৃষ্টি করে। অজানাকে জানা, নিষিদ্ধকে জয় করা মানুষের সহজাত আকাঙ্ক্ষা। যেহেতু ধর্ম নারীর মধ্যে নানা বিধিনিষেধ আরোপ করেছে, তাই পুরুষ নারীভোগে এতোটা বেপরোয়া হয়ে ওঠে; যাতে সমাজ বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে। কিন্তু উচিত সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ বিকাশের মাধ্যমে পুরুষ ও নারীর উপর আরোপিত পরস্পর বিরোধী সম্পর্ককে সহজতর করে তোলা। ধার্মিক ও মতবাদীদের মধ্যে পার্থক্য নেই। কেননা, তারা উভয়েই মনে করেন যে, নিজ নিজ ধর্ম বা মতবাদ অভ্রান্ত আর বাকী সব মিথ্যা। কিন্তু সংস্কৃতিবান মানুষ প্রজ্ঞা ও যুক্তিরস্নারা পরমত বিশেষণ করে সেখানে সভ্যতার প্রগতিমুখীনতা অনুসন্ধান করেন। সে দিক থেকে কালচার্ড মানুষ ধার্মিক ও মতবাদী যে-কারো চেয়ে যথেষ্ট গোঁড়ামিমুক্ত হন। প্রেমের সাধনার মাধ্যমে অর্জিত হয় সুসংস্কৃতি এবং ব্যক্তিমাত্রই স্বতন্ত্র পথে এ গন্তব্যে পৌঁছুতে পারেন। সৌন্দর্য, সত্য আর জ্ঞানের পথে প্রেমের সাধনাই এখানে প্রথম এবং প্রধান। কালচার্ড মানুষ তাই ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তির জন্যে বাঁচেন না, মহত্তর জীবন যাপনের জন্যে খাদ্যাহার গ্রহণ করেন।

প্রগতি ও সভ্যতা এক নয় — যদিও অনেকেই অভিন্ন মনে করেন। উৎপাদনের সঙ্গে প্রগতির সংশ্লিষ্টতা; এখানে সৌন্দর্য ও কল্যাণের সম্পর্ক অত্যাবশ্যকীয় নয়। কিন্তু সভ্যতা হলো প্রগতির সঙ্গে অত্যাবশ্যকীয়ভাবে সৌন্দর্য ও কল্যাণের সমন্বয়, উপরন্তু প্রেমের যথাযথ সংশেষ। কালচার্ড মানুষ স্বভাবতই সভ্যতাকামী হন। তবে সভ্যতার পাশাপাশি মূল্যবোধের ব্যাপ্তি জরুরি। মূল্যবোধের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর ভর করে মানুষের সংস্কার মুক্তি ঘটে থাকে। সংস্কার মুক্তি অর্থ যথেচ্ছাচার নয়। অবাধ যৌনাচার তাই কালচার্ড মানুষের কাম্য হতে পারে না। কামনার স্থূলত্ব নয়, প্রেমের মহত্ত্বই সংস্কৃতিবান মানুষের কাছে বড়। মানুষ সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করে পরিপূর্ণ বা ৎরঢ়ব হন। তিনি মহৎ, সুন্দর ও যথাযথভাবে বেঁচে থাকেন বিবেক জাগ্রত করে — প্রেমময় হয়ে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন

**সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের উত্তর লিখুন**

১. 'ইন্দ্রিয়ের পঞ্চপ্রদীপক জ্বেলে জীবনসাধনা' বলতে লেখক কি বুঝিয়েছেন?
২. নারী কালচারের অপরিহার্য উপাদান কেন?
৩. সভ্যতা বলতে এখানে কি বুঝানো হয়েছে?
৪. মানুষের সংস্কারমুক্তি ঘটে কিভাবে?

**২ নং সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের নমুনা-উত্তর**

মনুষের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের স্বাধীনতা ও নবজন্মদানের ব্যাপারে কালচার সর্বাপেক্ষা অধিক উৎসাহ প্রদান করে। নারী এই ইন্দ্রিয় সাধনার জাগরণ ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। নারীর চোখ-মুখ, স্নেহ-প্রীতি, সৌন্দর্য ও লজ্জা নিয়েই শিল্প-সাহিত্যের কারবার। আর এই শিল্প-সাহিত্যই হলো কালচারের বাহন। মানুষের, বিশেষত পুরুষের সুশীলবোধ নারীর সান্নিধ্যেই জাগ্রত হয় এবং জীবনে শক্তি সাহস ও প্রেরণা লাভ করে। মানসিক সমৃদ্ধি আর সাংসারিক সর্বপ্রকার অগ্রবর্তিতার মূলেও হলো নারী। কালচার যেহেতু মানুষের মনোজাগতিক উন্নয়নের মাধ্যমে তার মধ্যে প্রেম-আনন্দ ও ন্যায়বোধের সৃষ্টি করে সেহেতু নারী কালচারের অপরিহার্য উপাদান হয়ে ওঠে।

**প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ব্যাখ্যা করুন**

১. সংস্কৃতি মানেই আত্মনিয়ন্ত্রণ — নিজের আইনে নিজেকে বাঁধা।
২. যদি বলা হত প্রেম ভালো, আনন্দ ভালো, প্রেমের জন্যে প্রতীক্ষা ভালো, আনন্দের জন্য প্রতীক্ষা ভালো, তাহলে পৃথিবীর চেহারা হয়তো এতো কদর্য হতো না।
৩. অমৃতকে কামনা, তথা প্রেমকে কামনা, সৌন্দর্যকে কামনা, উচ্চতর জীবনকে কামনা, এইতো সংস্কৃতি।
৪. জ্ঞানের ক্ষেত্রেই পরিবর্তনশীলতা অবধারিত, সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে নয়।
৫. বাঁচা, বাঁচা, বাঁচা। প্রচুরভাবে গভীরভাবে বাঁচা। বিশ্বের বুকে বুকে বুক মিলিয়ে বাঁচা।

**৩ নং ব্যাখ্যার নমুনা-উত্তর**

আলোচ্য অংশটুকু মোতাহের হোসেন চৌধুরী রচিত 'সংস্কৃতি-কথা' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে নেয়া হয়েছে। এখানে সংস্কৃতি সাধনায় প্রার্থিত উপাদান সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে।

সংস্কৃতি ব্যক্তিমনকে বিকশিত করে ও মুক্তি দেয়। ধর্ম যেখানে অবিশ্বাসীদের উপর নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে, মতবাদ যেখানে পরমত সহ্য ও স্বীকার করে না, সেখানে সংস্কৃতি সত্যদর্শন ও মুক্তির আলোকে অন্যকে মেনে নেয়। প্রেম ও সৌন্দর্যই একজন সংস্কৃতিবানের কাছে বড়ো। উচ্চতর জীবন গড়ার লক্ষ্যে মনুষ্যত্ব ও মূল্যবোধ অর্জন প্রধান হয়ে ওঠে তার সামনে। সংস্কৃতি মানুষকে 'মানুষ' ভাবতে শেখায়। কারণ জ্ঞানেন্দ্রিয় সাধনায় প্রেম ও সৌন্দর্য তার সামনে বড় হয়ে ওঠে। এই প্রেম ও সৌন্দর্যের আলোকে উচ্চতর জীবনের সোপান তৈরি করে সংস্কৃতি।

**রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর লিখুন**

১. মোতাহের হোসেন চৌধুরীর 'সংস্কৃতি-কথা' প্রবন্ধের মূল বক্তব্য বিবৃত করুন।
২. ধার্মিক ও মতবাদীদের সঙ্গে কালচার্ড মানুষের পার্থক্য কোথায়? 'সংস্কৃতি-কথা' প্রবন্ধের অনুসরণে লিখুন।
৩. মোতাহের হোসেন চৌধুরীর 'সংস্কৃতি-কথা' প্রবন্ধ অবলম্বনে সংস্কৃতির সংজ্ঞা প্রদান করুন।
৪. 'সংস্কৃতি মানে সুন্দরভাবে, বিচিত্রভাবে, মহৎ ভাবে বাঁচা'— আলোচনা করুন।

**৩ নং রচনামূলক প্রশ্নের নমুনা-উত্তর**

'সংস্কৃতি' আভিধানিক অর্থে যদিও অনুশীলন দ্বারা লব্ধ বিদ্যাবুদ্ধি রীতি-নীতির উৎকর্ষ — তবুও প্রকৃত সংজ্ঞা নিরূপন করা খুবই কঠিন। মোতাহের হোসেন চৌধুরী তাঁর 'সংস্কৃতি-কথা' প্রবন্ধে সংস্কৃতির একটি সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা প্রদান করার প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর মতে, সংস্কৃতি অর্থ মানুষের সুন্দরভাবে, বিচিত্রভাবে ও মহৎ ভাবে বেঁচে থাকা। এই জীবনকে তিনি বলেছেন, 'বাঁচা, বাঁচা, বাঁচা। প্রচুরভাবে, গভীরভাবে বাঁচা। বিশ্বের বুকে বুকে বুক মিলিয়ে বাঁচা।'
প্রকৃতপক্ষে, সংস্কৃতি হলো সেই অধরা প্রতীতি, যা আচার, অনুভূতি সৎ চিন্তা ও মার্জিত রুচিবোধ দ্বারা জীবনকে পরিশীলিত করে তোলে। মোতাহের হোসেন চৌধুরী তাঁর প্রবন্ধের সূচনা করেছেন একটি প্রথাবিরুদ্ধ বাক্যের মাধ্যমে;

এবং তাহলো, 'ধর্ম সাধারণ লোকের কালচার, আর কালচার শিক্ষিত মার্জিত লোকের ধর্ম।' তিনি মনে করেন, নিষ্ঠুরতা দিয়ে মহৎ কোন কিছু অর্জিত হতে পারে না। তাই অন্যায় নিষ্ঠুরতা যেমন, তেমনি ন্যায় নিষ্ঠুরতাও সমানভাবে পরিত্যাজ্য। সুন্দরের আরাধনাকে তিনি সম্মান জানিয়েছেন, মুক্ত মনকে জানিয়েছেন আহ্বান। নির্মল আনন্দ উপভোগ ও অপাপবিদ্ধ প্রেমচেতনার উন্মেষ ঘটে সংস্কৃতি থেকে। নিয়ন্ত্রিত, সংযত ও সুশৃঙ্খল জীবন থেকে সৃষ্টি হয় প্রকৃত সংস্কৃতির। পরিশুদ্ধতর হয়ে মননের বিকাশের মধ্যদিয়ে সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করতে হয়। অনিয়ন্ত্রিত জীবন বা যথেচ্ছ পাপাচারে সুস্থ সংস্কৃতির স্বচ্ছ জলধারাতে পঙ্কিলতা জন্মে। মোতাহের হোসেন চৌধুরী মনে করেন যে, কালচার ব্যক্তিতান্ত্রিক। মানুষ এককভাবে অনুশীলন ও পরিশীলনের মধ্যদিয়ে কালচার্ড বা সংস্কৃতিবান হয়ে উঠতে পারে। নিজের সৌন্দর্যবোধের উন্মোচন, প্রতিভার বিকাশ এবং জীবনের শ্রেষ্ঠ ও বহুভঙ্গিম প্রকাশের মধ্যদিয়ে মানুষ স্বতন্ত্র পথে সংস্কৃতিবান হন। সমাজের দিকে তাকিয়ে থাকলে সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে না, বরং সমাজ মানুকে একপেশে ও প্রমাণ-সাইজ করে রাখে। কিন্তু তাই বলে কালচার্ড মানুষ সমাজ বিচ্ছিন্ন নন। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সংস্কৃতি পরিশীলনের মধ্যদিয়েই তারা সমাজকে অনিন্দ্য সুন্দর করে তোলেন। সমাজের সঙ্গে অবশ্য মতবাদের সম্পর্ক থাকতে পারে। মোতাহের হোসেন চৌধুরী মতবাদী ও ধার্মিক উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য দেখতে পেয়েছেন। কেননা, তারা উভয়ে নিজেদের অভ্রান্ত মনে করে এবং পরমত স্বীকার করে না। অথচ মতবাদ সরকারি স্টিমরোলারের সাহায্যে আর ধর্ম ভয় ও লোভের দ্বারা মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করতে চায়। সংস্কৃতি সৃষ্টি করে আনন্দ — এখানে নির্যাতন বা লোভ-ভয় নেই।

ইন্দ্রিয় সাধনার মধ্যদিয়ে সংস্কৃতি বিকশিত হয় বলে মোতাহের হোসেন চৌধুরী মনে করেন। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পঞ্চপ্রদীপ জ্বালবার কথা বলেছেন তিনি। তাঁর মতে 'চোখ ও কান আত্মার জিহ্বা'; অথচ ধর্ম ও মতবাদ এ দুটোকে বন্ধ রাখতে বলে। কিন্তু সংস্কতি সত্যদর্শন ও যুক্তিপ্রদর্শনের মধ্যদিয়ে মানুষকে আত্মমুক্তির ডাক দেয়। নারীর সৌন্দর্য ও প্রেরণা কালচার্ডদের কাম্য। যে নারী মানব সমাজের অর্ধেক, তাকে বাদ রেখে সংস্কৃতির বিকাশ ঘটতে পারে না। নারীর মধ্যে কাম নয়, প্রেম ও সৌন্দর্য অনুসন্ধান করেন সংস্কৃতিবান মানুষ। সংকীর্ণতা সংকোচ ও দ্বিধা বর্জন করে উদার বিশ্বাসে মানবজীবনের পূর্ণ বিকাশই সংস্কৃতির লক্ষ্য। সংস্কৃতি আত্মনিয়ন্ত্রণ শিক্ষা দেয় বলে মানুষ প্রেমেরদ্বারা কাম নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। তাই নারী হয়ে ওঠে তার কাছে নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধির প্রেরক ও উচ্চতর জীবনের সহায়ক।

মোতাহের হোসেন চৌধুরী বর্তমান প্রবন্ধে বলেছেন, 'যেখান ফ্রি থিংকিং নেই সেখানে কালচার নেই।' এই ফ্রি থিংকিং বা মুক্তচিন্তা সংস্কৃতির প্রাণ যা মানুষকে প্রথাবদ্ধতা থেকে মুক্তি দেয়। ধর্ম বা মতবাদ যেমন চিন্তাকে গন্ডিবদ্ধ করে রাখে, সংস্কতি তেমন করে না। ফলে ভালোমন্দ ভেবে সংস্কৃতিবান মানুষ একটা মূল্যবোধ সৃষ্টি করতে পারে। এ জন্যে কোন নির্দিষ্ট পথ অনুসরণ করার দরকার নেই। যে-যার নিজ পথেই অগ্রবর্তী হতে পারেন অমৃত প্রেম আর সৌন্দর্যের দিকে। কেননা, লেখকর মতে 'অমৃতের কামনা, তথা প্রেমকে কামনা, সৌন্দর্যকে কামনা, উচ্চতর জীবনকে কামনা, এই তো সংস্কৃতি'। সংস্কৃতি আমাদের শিক্ষা দেয় — কামের চেয়ে প্রেম, ভোগের চেয়ে উপভোগ বড়।

'সংস্কৃতি-কথা' প্রবন্ধে মোতাহের হোসেন চৌধুরী উপরিউক্তভাবে সংজ্ঞা প্রদান করে মানব জীবনে এর প্রয়োজনীয়তার প্রসঙ্গ তুলেছেন। কামনিবৃত্তি ও খাদ্যগ্রহণই মানব ধর্ম নয়। মানুষের উচিত, 'সুন্দরভাবে, বিচিত্রভাবে, মহৎভাবে বাঁচা'। — এবং প্রেমের ফল্গুধারায় চতুর্দিক ভাসিয়ে দেয়া। কারণ সংস্কৃতি হলো 'প্রচুরভাবে গভীরভাবে বাঁচা'। আর সংস্কৃতিবান হওয়া অর্থ প্রেমবান হওয়া।

**পাঠ-৫.১**

# বাংলা গদ্যরীতি

## মুনীর চৌধুরী

**(১৯২৫-১৯৭১ )**

### উদ্দেশ্য

### এ পাঠ শেষে আপনি —

- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রবর্তিত গদ্যরীতির পূর্ববর্তীকালের বাংলা গদ্যের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বাংলা গদ্য উদ্ভবের প্রথম চার দশকের গদ্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিখতে পারবেন।
- বাংলা গদ্যের সূচনাপর্বে যে তিন ধরনের গদ্যরীতি লক্ষ্য করা যায় সেগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।

# ভূমিকা

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত বিভক্তির মধ্য দিয়ে সৃষ্ট পাকিস্তানের সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষের মুখের ভাষা ছিলো বাংলা। পূর্ব পাকিস্তানের চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ এই ভাষাকে রাষ্ট্রের সরকারি অফিস-আদালতসহ জীবনের সর্বস্তরে ব্যবহারের কথাটি বিশেষ গুরুত্ব সহকারে ভাবেন। বর্ণমালা সমস্যা, বানান জটিলতা, লিপিসংস্কার ইত্যাদিও এই ভাবনায় স্থান পায়। এই প্রেক্ষাপটে মুনীর চৌধুরীর কতিপয় বক্তব্য স্থান পেয়েছে 'বাংলা গদ্যরীতি' প্রবন্ধে।

## লেখক পরিচিত

১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দের ২৭ নভেম্বর মানিকগঞ্জ জেলায় মুনীর চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈত্রিক বাড়ি ছিলো নোয়াখালি জেলায়। ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করেন। ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আই.এস.সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দে অনার্সসহ ইংরেজিতে স্নাতক হন এবং পরের বছর স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে জেলে আটক থাকা অবস্থায় মুনীর চৌধুরী প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে বাংলায় এম.এ. পাশ করেন। ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেন ও ১৯৫৮ সালে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্জন করেন ভাষাতত্ত্বে এম.এ ডিগ্রি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবস্থায় তিনি যোগদান করেন 'প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘে'। ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট পার্টির কংগ্রেসে অংশগ্রহণ করেন। মূলত এ সময় থেকেই মুনীর চৌধুরীর সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক জীবন শুরু। একই বছর খুলনার ব্রজলাল (বি.এল) কলেজে ইংরেজি ও বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। ১৯৪৯-এ রাজনৈতিক তৎপরতার দায়ে কারারুদ্ধ হন। পরের বছর মুক্তি পেয়ে প্রথমে জগন্নাথ কলেজে ও পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে যোগদান করেন। ১৯৫২-তে ভাষা আন্দোলনে অংশ নেয়ার দায়ে পুনরায় কারারুদ্ধ হন। মুক্তি পেয়ে ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অধ্যাপনায় যোগ দেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম চলাকালে পাকিস্তানী সৈন্যদের অনুচর স্বাধীনতাবিরোধী আলবদর বাহিনী ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ ডিসেম্বর তাকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন।

মুনীর চৌধুরী গদ্যলেখক হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত। ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দের 'সওগাত' পত্রিকায় প্রকাশিত 'সতেরো শতাব্দীর হেয়কয়ি কবিতা' সম্ভবত তাঁর প্রথম রচনা। এর পর ছোটগল্প ও নাটক রচনায় মনোনিবেশ করেন। কারাগারের অভ্যন্তরে রচিত ও মঞ্চস্থ হয় তাঁর নাটক 'কবর'। নাটক রচনার প্রথাবদ্ধতা ছিন্ন করে তিনি নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অবতীর্ণ হন। সাহিত্য-সমালোচনায় তিনি তুলনামূলক পদ্ধতিও প্রয়োগ করেন। তার গদ্য পরিশীলিত, সাবলীল ও পরিমিতিময়। মুনীর চৌধুরীর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: **রক্তাক্ত প্রান্তর** (১৯৬২), **মীরমানস** (১৯৬৫), **কবর** (১৯৬৬), **তুলনামূলক সমালোচনা** (১৯৬৯), **বাংলা গদ্যরীতি** (১৯৭০), **মুখরা রমণী বশীকরণ** (১৯৭০) ইত্যাদি।

## পাঠ-পরিচিতি

১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে পাকিস্তান সৃষ্টি হবার পর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও চিন্তাবিদগণ প্রাত্যহিক জীবনচর্চা ও সরকারি অফিস-আদালতের সর্বস্তরে বাংলা ভাষার প্রয়োগের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পূর্ব পাকিস্তানে সরকারি ভাষা কমিটি গঠিত হয়। এর অন্যতম সদস্য ছিলেন মুনীর চৌধুরী। তিনি বাংলা গদ্যরীতি সম্পর্কিত একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। বর্তমান প্রবন্ধটি তাঁর রচিত 'বাংলা গদ্যরীতি' (১৯৭০) পুস্তকের অবতরণিকা 'সাহিত্য নির্দেশ' অধ্যায় থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

যদিও গ্রন্থের অবতরণিকা অংশ থেকে বর্তমান প্রবন্ধটি গৃহীত তবুও এর নামকরণে গ্রন্থটির নামই যুক্তিযুক্তভাবে নেয়া হয়েছে। কারণ এই প্রবন্ধটি মূলত বাংলা গদ্যরীতি প্রচলনের এক পূর্ণাঙ্গ কিন্তু সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। সে দিক থেকে নামকরণটি যথাযথ। যেহেতু বিষয়বস্তু অথবা অন্তর্নিহিত ভাবকে অবলম্বন করে প্রবন্ধের নামকরণ হয়ে থাকে, সেহেতু বর্তমান প্রবন্ধের নামকরণও বিষয়বস্তুকে নির্ভর করেই হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা গদ্যসাহিত্যের উদ্ভবের ইতিহাস থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর আধুনিক গদ্য নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও চর্চার মধ্যদিয়ে গড়ে উঠেছে। এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছিলো মূলত শব্দ নির্বাচন, বাক্যিক সংগঠন ও ভাষার গতিশীলতা নিয়ে। গদ্যচর্চার প্রথম দিকে এর শিল্পগুণের দিকে লক্ষ্য রাখা হয়নি। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের হাতেই প্রথম বাংলা গদ্য শিল্পিতভাবে উপস্থাপিত হয়। তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিদ্যাসাগরকে বাংলা গদ্যের 'প্রথম শিল্পী' বলে অভিহিত করেছেন।

# মূলপাঠ

১.১. বাংলা গদ্যের জন্ম ঊনবিংশ শতাব্দীতে। এই সময়ের পূর্বেকার দলিলদস্তাবেজ ও চিঠিপত্রে ব্যবহৃত যে গদ্যের নমুনা আমাদের হস্তগত হয়েছে তার রূপ ও প্রকৃতি অনির্দিষ্ট এবং অপরিস্ফুট, বিচ্ছিন্ন এবং খন্ডিত। কোনো গদ্য নিবন্ধ বা গ্রন্থের পরিপূর্ণ আকারে তা রূপায়িত বা প্রচারিত হয়নি। তার সাহিত্যিক মূল্য অকিঞ্চিৎকর এবং পরবর্তীকালের বাংলা ভাষার ক্রমবিকাশের ধারার সঙ্গে এর যোগসূত্র সুরক্ষিত নয়।

১.২. ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকেও বাংলা গদ্য, শব্দ চয়নে, পদ গঠনে বা বাক্য সংগঠনে কোনো স্থির সুনির্দিষ্ট আদর্শের অনুসারী ছিল না। সবই ছিল পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক। লেখকগণ সচেতনভাবে চেষ্টা করেছেন বাংলা ভাষার আন্তর-প্রকৃতিকে আবিষ্কার করতে। তৃতীয় চতুর্থ দশকে বাংলা গদ্য বহুল পরিমাণে স্বাভাবিকতা ও প্রাঞ্জলতা অর্জন করেছিল সত্য কিন্তু এ গদ্যও কোনো বিশিষ্ট শিল্পগুণসম্পন্ন ছিল না। যে প্রতিভা বাংলা গদ্যকে প্রথম এই ঐশ্বর্যে পরিমন্ডিত করেন তাঁর নাম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, যে গ্রন্থদ্বারা এই কীর্তি সম্পাদিত হয় তার নাম 'বেতালপঞ্চবিংশতি', রচনাকাল ১৮৪৭। বিদ্যাসাগর প্রবর্তিত গদ্যই পরবর্তীকালের বাংলা ভাষার বহুমুখী বিকাশের রীতিগত ভিত্তিভূমি।

১.৩. পৃথিবীর অন্যান্য ভাষার মত বাংলা ভাষার ক্রমবিকাশ পরীক্ষা করলেও যে সত্যটি উপলব্ধি করা যায় তা হল এই যে, ভাষা পরিবর্তনশীল এবং বৈচিত্র্যের অনুসন্ধানী। সমাজ-সংগঠনের রূপান্তর, চিন্তার বিবর্তন, রস-পিপাসার নব নব রূপায়ণ যুগে যুগে নতুন প্রতিভার আবির্ভাবের উপযোগী পরিবেশ রচনা করে। কালক্রমে শিল্পীর প্রতিভা ভাষায় নতুন সুর ও শক্তি সংযোজিত করে, নতুন আঙ্গিক ও রসের জন্ম দেয়।

১.৪. বাংলা গদ্যের উন্মেষ-পর্বেও রীতি-বৈচিত্র্যের আভাস লক্ষণীয়। কেরীর 'কথোপকথন'-এ ইতরজনের মৌখিক বুলির অসংস্কৃত প্রয়োগ, রামরাম বসুর 'প্রতাপাদিত্য চরিত্র'-এ আরবী-ফারসী শব্দের বিষয়োপযোগী ব্যবহার, মৃত্যুঞ্জয়ের 'বত্রিশ সিংহাসন'-এ সংস্কৃত পদগঠন ও বাক্যগঠন-রীতির অত্যধিক অনুসরণ পরবর্তীকালের বাংলা গদ্যরীতির তিনটি স্বতন্ত্র বিকাশ-ধারার সংকেত বহন করে। সমকালীন জীবনের আলেখ্য রচনায় কথ্যবুলির কৌশলময় ব্যবহার টেকচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল'-কে স্মরণীয় সরসতা ও প্রাণবন্ততা দান করেছে। দীনবন্ধুর প্রহসনে এই ভাষাতেই চূড়ান্ত নাটকীয় উৎকর্ষ লাভ করেছে। রামরাম বসুর আরবী-ফারসী শব্দ-সম্ভারের প্রতি পক্ষপাতিত্ব বিংশ শতাব্দীর একাধিক মুসলমান লেখকের রচনায় বিস্তৃততর অভিব্যক্তি লাভ করেছে। মৃত্যুঞ্জয়ের অতিপন্ডিতী-রীতির শিল্পগুণ-মন্ডিত সার্থক রূপায়ণ আছে বিদ্যাসাগরের কোনো কোনো রচনায়। বঙ্কিম, টেকচাঁদ ও বিদ্যাসাগর উভয়ের রচনার দুই বিশিষ্ট প্রকৃতির শক্তির সমন্বয় সাধন করে প্রতিষ্ঠিত করেন তাঁর নিজস্ব গদ্যের এক হৃদয়গ্রাহী আদর্শ রূপকে। এই ভাষাতেই নিজের অনন্যসাধারণ ভাবকল্পনার উপযোগী বাহনরূপে পুনর্গঠিত করেন রবীন্দ্রনাথ; ভাষাকে করে তোলেন সূক্ষ্ম ও প্রগাঢ়, সংকেতময় এবং সংগীতময়, বহু বর্ণশোভিত ও কারুকার্যমন্ডিত। কিন্তু রাবীন্দ্রিক গদ্যরীতিও প্রথম চৌধুরীর পুরোপুরি মনঃপূত হয়নি। বিদগ্ধজনের কথ্য বুলির আদলে তিনি সৃষ্টি করলেন নতুন এক প্রখর ও শাণিত গদ্যের ধারা। পরিবর্তনের জোয়ার যে

এখানে এসেই থেমে গেছে তা নয়। শরৎচন্দ্র কি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, মুজতবা আলী কি অন্নদাশঙ্কর রায় প্রত্যেকেই নিজ নিজ ব্যক্তিমানসের বিশিষ্ট প্রতিভা, প্রয়োজন ও প্রবণতা অনুযায়ী বাংলা গদ্যরীতিকে যথার্থ বহুমাত্রিকতা দান করেছেন। দেড়শত বৎসরের বাংলা গদ্যের বিচিত্র ঐশ্বর্যে এই ঐতিহ্যকে সম্পূর্ণরূপে শোষণ করে নিয়েই প্রতিভাবান পূর্ব পাকিস্তানী সাহিত্যকর্মী আজ বাংলা ভাষার প্রকাশ-ক্ষমতার নব নব দিগন্ত উন্মোচনে ব্যাপৃত।

১.৫. বলাবাহুল্য, বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশের উপরোক্ত বর্ণনা নিতান্তই সংক্ষিপ্ত এবং সামান্য। বিদ্যাসাগরী গদ্য, আলালী গদ্য, বঙ্কিমী গদ্য প্রভৃতি নামাঙ্কন মোটামুটিভাবে কয়েকটি স্বতন্ত্র গদ্যরীতির সাধারণ বৈশিষ্ট্যবোধক হলেও প্রকৃতপক্ষে এঁরা কেউ একক প্রণালীর গদ্য রচনা করেই ক্ষান্ত হননি। প্রত্যেকেই তঁদের সাহিত্য-জীবনের বিভিন্ন পর্বে বিভিন্ন ধরনের গদ্যরীতির উদ্ভাবন ও অনুশীলন করেছেন। বিদ্যাসাগরের সর্বশেষ রচনা-সমূহের ভাষা মৌখিক বুলির মতই সরল ও অনর্গল এবং তাতে আরবী-ফারসী শব্দের প্রয়োগও প্রচুর। অপরপক্ষে টেকচাঁদের অনেক রচনারই বিষয়বস্তু আধ্যাত্মিক। ভাষা সাধু এবং সংস্কৃতানুসারী। বঙ্কিমের 'দুর্গেশনন্দিনী'র (১৮৬৫) ভাষা ঝংকারময় এবং পান্ডিত্যপূর্ণ, 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩)-এর ভাষা বলিষ্ঠ হয়েও নমনীয়, আড়ম্বরহীন হয়েও ক্রীড়াশীল। এ সব কথা যদিও পুরাতন এবং বিদিত তবু যাঁরা জবরদস্তি ইতিহাস উপেক্ষা করে অগ্রসর হতে উদ্যোগী তাঁদের কথা স্মরণ করে পুনরুক্তি আবশ্যক বিবেচনা করেছি।

## শব্দার্থ ও টীকা

**ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—** প্রকৃত নাম ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা। জন্ম ১৮২০ খ্রিষ্টাব্দে, মৃত্যু ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দে। পিতার নাম বীরসিংহ শর্মা। বাংলার নবজাগরণের প্রাণপুরুষ এবং সমাজসংস্কারক। বিধবা বিবাহ প্রবর্তন, নারী শিক্ষা ও বহুবিবাহরদ আন্দোলনের পুরোধা। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি বাংলা গদ্যের জনক হিসেবে অভিহিত।

**বেতালপঞ্চবিংশতি—** ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রচিত গ্রন্থ; রচনাকাল ১৮৪৭ খ্রিষ্টাব্দ।

**সমাজ-সংগঠনের রূপান্তর—** সমাজের অভ্যন্তরীণ ও বহির্গত স্তর-কাঠামোর পরিবর্তন।

**কেরী—** উইলিয়াম কেরী। ১৮০১ খ্রিষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে প্রতিষ্ঠিত বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। একই সনে 'কথোপকথন' নামে তাঁর গদ্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে মৌখিক ভাষার হুবহু প্রয়োগ দেখা যায়।

**কথোপকথন—** উইলিয়াম কেরী রচিত গদ্যগ্রন্থ; প্রকাশকাল ১৮০১ খ্রিষ্টাব্দে।

**রামরাম বসু—** উইলিয়াম কেরীর প্রথম ও প্রধান সহায়ক পন্ডিত। ১৮১৩ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। ফারসী ভাষায় সুপন্ডিত ছিলেন। নিজের রচিত গদ্যগ্রন্থে প্রচুর আরবী-ফারসী ভাষার প্রয়োগ করেন।

**মৃত্যুঞ্জয়—** মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। উইলিয়াম কেরীর অধীনে নিয়োজিত প্রধান পন্ডিত। ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যু হয়। সংস্কৃত ভাষায় অসাধারণ দখল ছিলো। পাঁচটি বাংলা গ্রন্থ লেখেন। তাঁর গদ্যরীতি সংস্কৃত ব্যাকরণ-অনুসারী।

**বত্রিশ সিংহাসন—** মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার রচিত গদ্যগ্রন্থ। প্রকাশকাল ১৮০২ খ্রিষ্টাব্দ।

**টেকচাঁদ—** টেকচাঁদ ঠাকুর। প্যারীচাঁদ মিত্রের লেখক নাম। ১৮১৩ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ ও ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। বাংলা গদ্যে কথ্য ভাষারীতির তিনি প্রবর্তক। তাঁর মতে, সংস্কৃত শব্দবহুল গদ্যরীতির পরিবর্তে প্রচলিত শব্দনির্ভর সরল গদ্যই বাংলা ভাষায় আদর্শ হওয়া উচিত। এই গদ্যরীতিতে 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৭) গ্রন্থটি রচনা করেন।

**দীনবন্ধু—** দীনবন্ধু মিত্র; জন্ম ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে, মৃত্যু ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দে। আধুনিক বাংলা নাটকের অন্যতম প্রাণপুরুষ। 'নীলদর্পন' (১৮৬০) তার বিখ্যাত নাটক। এছাড়া তিনি কয়েকটি প্রহসনও রচনা করেন।

**সংকেতময়তা ও সঙ্গীতময়তা—** ভাষার প্রধান দুটি গুণ। রূপ-প্রতীকের আশ্রয়ে রচনার অতিরিক্ত ভাবপ্রকাশ এবং তাতে হৃদয় মনোমুগ্ধকারী সুরের আবহ সৃষ্টি।

**রাবীন্দ্রিক গদ্য** — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত গদ্য বা তাঁর গদ্যভঙ্গির বৈশিষ্ট্য অনুসারে রচিত অন্য কারো গদ্য।

**দুর্গেশনন্দিনী—** ১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিত বাংলা ভাষায় প্রথম পূর্ণাঙ্গ, মৌলিক ও সার্থক উপন্যাস। মুঘল ও পাঠানের রাজনৈতিক ক্ষমতালিপ্সার পটভূমিকায় বিন্যস্ত আলোচ্য উপন্যাসটিতে শাশ্বত মানব প্রেমের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

**বিষবৃক্ষ—** ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত সামাজিক উপন্যাস।

## বস্তু-সংক্ষেপ

বাংলা গদ্যের উদ্ভব উনিশ শতকে। এর পূর্বকালে রচিত বাংলা গদ্যের যে নমুনা পাওয়া যায় তার রূপ ও প্রকৃতি একদিকে অনির্ধারিত এবং অস্পষ্ট, অন্যদিকে বিযুক্ত ও কর্তিত। ফলে বাংলা ভাষার ক্রমবিকাশের ধারায় এগুলো সুরক্ষিত নয়। উনিশ শতকের প্রথম চার দশকেও বাংলা গদ্য তেমন বলিষ্ঠ হয়ে ওঠেনি। প্রথম দুই দশক ছিলো নিতান্তই পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক; তৃতীয় ও চতুর্থ দশক সরল গদ্য গড়ে উঠলেও তা শিল্পগুণসম্পন্ন ছিলো না। ঈশ্বরচন্দ্র বিদাসাগর প্রণীত 'বেতালপঞ্চবিংশতি' (১৮৪৭) গ্রন্থের মাধ্যমেই বাংলা গদ্য প্রথম ঐশ্বর্য-পরিমন্ডিত হয়ে ওঠে।

পৃথিবীর অন্যান্য ভাষার মতো বাংলা ভাষাও পরিবর্তনশীল ও বৈচিত্র্যের অনুসন্ধানী। বাংলা গদ্যের সূচনা পর্বে উইলিয়াম কেরী অনুসৃত মৌখিক বুলির হুবহু প্রয়োগরীতি, রামরাম বসু অনুসৃত আরবী-ফারসী শব্দের বিষয়োপযোগী ব্যবহার রীতি ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার অনুসৃত বাংলায় সংস্কৃত ভাষারীতি অনুসরণের ত্রিবিধ ধারার জন্ম হয়। পরবর্তীকালে টেকচাঁদ ঠাকুর, দীনবন্ধু মিত্র প্রমুখ মৌখিক বুলির প্রয়োগরীতিতে সাফল্য অর্জন করেন। রামরাম বসুর পথ অবলম্বর করেন মুসলমান লেখকগণ। বিদ্যাসাগরের মধ্যে দেখা যায় মৃত্যুঞ্জয়ী গদ্যরীতির প্রভাব। বঙ্কিমচন্দ্র টেকচাঁদ ও বিদ্যাসাগর উভয়ের রচনা-প্রকৃতিকে সমন্বিত করে হৃদয়গ্রাহী এক গদ্যভঙ্গি উপস্থাপন করেন। এই গদ্যভাষাকে আরো অধিক শিল্পমন্ডিত করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রথম চৌধুরী রাবীন্দ্রিক গদ্যরীতিকে অতিক্রম করে কথ্য বুলির আদলে সৃষ্টি করেন নতুন এক প্রখর ও শাণিত গদ্যধারা। পরবর্তীকালে শরৎচন্দ্র, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, মুজতবা আলী, অন্নদাশঙ্কর রায় প্রমুখের হাতে বহুমাত্রিকতা লাভ করেছে। সে পথ ধরেই পূর্ব-পাকিস্তানী সাহিত্যকর্মীগণ বাংলা ভাষার নতুন দিক উন্মোচনে ব্যাপৃত। আজ বিদ্যাসাগরী গদ্য, আলালী গদ্য, বঙ্কিমী গদ্য ইত্যাদি ব্যক্তি-নামাঙ্কিত স্বতন্ত্র গদ্যরীতির পরিচয় পাওয়া গেলেও, বলাবাহুল্য, এই ব্যক্তিবর্গ সর্বদাই একরীতিতে গদ্যচর্চা করেননি।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন

**সংক্ষিপ্ত-উত্তরমূলক প্রশ্ন**

১. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রবর্তিত গদ্যরীতির পূর্ববর্তীকালের বাংলা গদ্য মূলত কিরূপ ছিলো?
২. বাংলা গদ্য উদ্ভবের প্রথম চারদশকে যে ধরনের গদ্য রচিত হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।
৩. বাংলা গদ্যের সূচনাপর্বে যে তিন ধরনের রীতি লক্ষ্য করা যায় সেগুলো কি কি?

**২ নং সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্নেরমুনা উত্তরঃ**

মূলত ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা গদ্যের জন্ম। এর আগে দলিল বা চিঠিপত্রে গদ্যের যে রূপ দেখা যায় তা অপরিস্ফুট ও অনির্দিষ্ট। এর সাহিত্যিক মূল্য অকিঞ্চিৎকর এবং পরবর্তীকালের বাংলা ভাষার ক্রমবিকাশের ধারার সঙ্গে এর যোগসূত্র কম। উনিশ শতকের প্রথম দুই দশকেও বাংলা গদ্য শব্দ চয়নে, পদ গঠনে বা বাক্য সংগঠনে কোন স্থির সুনির্দিষ্ট আদর্শের অনুসারী ছিলো না। বাংলা ভাষার আন্তর-প্রকৃতি আবিষ্কারে উৎসাহী লেখকগণ মূলত এ সময় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে বাংলা গদ্য বহুল পরিমাণে স্বাভাবিকতা ও প্রাঞ্জলতা অর্জন করেছিলো সত্য, কিন্তু এ গদ্যও কোন বিশিষ্ট শিল্পগুণসম্পন্ন ছিলো না। প্রকৃতপক্ষে, বাংলা গদ্য উদ্ভবের প্রথম চার দশকে যে ধরনের গদ্য রচিত হয়েছে তা যেমন ঐশ্বর্য পরিমন্ডিত ছিলো না, তেমনি এর রীতিগত ভিত্তিভূমিও প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

**প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ব্যাখ্যা লিখুন**

১. বিদ্যাসাগর প্রবর্তিত গদ্যই পরবর্তীকালের বাংলা ভাষার বহুমুখী বিকাশের রীতিগত ভিত্তিভূমি।
২. পৃথিবীর অন্যান্য ভাষার মত বাংলা ভাষার ক্রমবিকাশ পরীক্ষা করলেও যে সত্যটি উপলব্ধি করা যায় তা হল এই যে, ভাষা পরিবর্তনশীল এবং বৈচিত্র্যের অনুসন্ধানী।
৩. দেড়শত বছরের বাংলা গদ্যের বিচিত্র ঐশ্বর্যে এই ঐতিহ্যকে সম্পূর্ণরূপে শোষণ করে নিয়েই প্রতিভাবান পূর্ব পাকিস্তানী সাহিত্যকর্মী আজ বাংলা ভাষার প্রকাশ-ক্ষমতার নব নব দিগন্ত উন্মোচনে ব্যাপৃত।

**২ নং ব্যাখ্যার নমুনা-উত্তর**

বক্ষ্যমান অংশটুকু মুনীর চৌধুরী রচিত 'বাংলা গদ্যরীতি' শিরোনামের প্রবন্ধ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। এখানে প্রবন্ধকার বাংলা গদ্য আলোচনা প্রসঙ্গে বাংলা ভাষার বিকাশধারায় এর পরিবর্তনশীলতা ও বৈচিত্র্যময়তার কথা বলেছেন।

পৃথিবীর সব ভাষাই নানা রকমের পরিবর্তনশীলতা ও বৈচিত্র্যের মধ্যদিয়ে অগ্রসরমান। বাংলা ভাষাও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাষাগুলোর একটি। এই ভাষাতেও পরিবর্তন অনিবার্য। বাংলা গদ্যের দিকে লক্ষ্য করলে যে সত্যটি অনুধাবন হয় তাহলো, উনিশ শতকের প্রারম্ভে এর সাহিত্যিক সূচনার পর নানাভাবে এখানে পরিবর্তন ও বৈচিত্র্য এসেছে। উনিশ শতকের প্রথম চার দশকে এই বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষ্যযোগ্য হয়ে না উঠলেও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'বেতালপঞ্চবিংশতি' (১৮৪৭) গ্রন্থ প্রকাশের পর থেকে তা স্পষ্টতর হয়ে উঠতে থাকে। পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, মুজতবা আলী প্রমুখের হাতে বাংলা গদ্য আরও বিকশিত হয়। প্রকৃতপক্ষে, ভাষার ক্রমবিকাশের সঙ্গে এর পরিবর্তনশীলতা ও বৈচিত্র্যের ইতিহাস অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। বাংলা ভাষাও এ থেকে মুক্ত নয়।

**পাঠ-৫.২**

## উদ্দেশ্য

## এ পাঠ শেষে আপনি—

- ভাষার মাধ্যমে যারা ধর্মীয় সাংস্কৃতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বলেন, বাংলা ভাষা সম্পর্কে তাদের প্রকৃত ধারণা কি তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- আঞ্চলিক ভাষার মহিমা কীর্তনের সঙ্গে সাহিত্য-শিল্পগত মহৎ প্রয়াসের আত্যন্তিক যোগাযোগ নেই কেন, এ সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- বাংলা ভাষা থেকে যারা সংস্কৃত শব্দসমূহ বা বহুল ব্যবহৃত আরবি ফারসি শব্দাবলী বর্জন করার কথা বলেন তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য শনাক্ত করতে পারবেন।
- পূর্ব-পাকিস্তানের যারা শিল্পী-মানসিকতা নিয়ে সাহিত্যচর্চা করেছেন তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

# মূলপাঠ

২.০. পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা গদ্যের রূপায়ণ ও অনুশীলনের বর্ণনাকে দুইভাগে ভাগ করা যেতে পারে। একদিকে রয়েছে পূর্ব পাকিস্তানী গদ্যের আদর্শ স্বরূপ সম্পর্কে নানাবিধ সোপারেশ, ভবিষ্যদ্বাণী ও তত্ত্বালোচনা; অন্যদিকে হল সৃষ্টির ক্ষেত্রে সাহিত্যিকদের বিভিন্নমুখী প্রয়াসের প্রত্যক্ষ ফসল। আমরা প্রথমে পন্ডিত সংস্কারক-গবেষকদের চিন্তা ও বাসনার শ্রেণী প্রকৃতি বিশেষণ করতে চেষ্টা করব, পরে প্রকৃত সাহিত্যকর্মে যে ভাষাদর্শের প্রতিফলন ঘটেছে তার বৈশিষ্ট্য নির্দেশে উদ্যোগী হব।

২.১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যাপক এবং আমার শিক্ষক পরলোকগত মোহিতলাল মজুমদার তৎকালীন বাংলা ভাষার গতি পরিবর্তনের চিহ্নসমূহ লক্ষ্য করে একটি সরস মন্তব্য করেন:

'ভাষার আদর্শ ক্ষুণ্ন করার প্রয়োজন দুই কারণে হইতে পারে — প্রথম, ভাষার আদর্শ সম্বন্ধে অজ্ঞতা, বিশুদ্ধ বাক্যরচনার অক্ষমতা; দ্বিতীয়, ভাষাকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়াও লেখকের নিজের খেয়াল-খুশী চরিতার্থ করিবার আগ্রহ... কিন্তু অজ্ঞতা ও অক্ষমতার প্রমাণ এতই স্পষ্ট যে, দ্বিতীয় কারণটির উল্লেখ বা আলোচনা অনাবশ্যক মনে হইতে পারে।'

দু:খজনক হলেও স্বীকার না করে উপায় নেই যে পূর্ব পাকিস্তানী গদ্যের উৎসাহী সংস্কারকদের অনেকেই প্রথমোক্ত দলের। দীর্ঘকাল ধরে ব্যবহারের ফলে বাংলা গদ্যরীতির যে-সকল আদর্শ সাহিত্যিক মর্যাদায় ভূষিত, বানান ও উচ্চারণের যে-সকল নিয়ম শিষ্ট ও শুদ্ধ বলে সম্মানিত, এঁরা অনেকেই সেগুলো শ্রম ও সাধনারদ্বারা আয়ত্ত করার সুযোগ-সুবিধা বা উৎসাহ-অনুপ্রেরণা লাভ করেননি। ফলে এই শ্রেণীর ভাষা-বিপবীগণ যে পর্যায়ের সংস্কারের ফরমান জারী করেন তা বাংলা ভাষার মূলগত বুনিয়াদের সচেতনতা থেকে উদ্ভূত নয়। নিজেদের ব্যক্তিগত অনভ্যাস বা অপারগতাকে মাত্রাতিরিক্ত রকম আদর্শায়িত করে স্বকপোলকল্পিত তামাদ্দুনিক স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা বা জনকল্যাণ সাধনের মহৎ অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। প্রচলিত বর্ণমালা এদের চক্ষুশূল; এরাই বানানে ণত্বষত্ব-বিধি নস্যাৎ করতে চান এবং পদগঠনে অভিনব নিয়ম প্রবর্তনে উদ্যোগী হন। বাংলা গ্রন্থ বিক্রয়ের বাজার যত সম্প্রসারিত হচ্ছে এঁদের তৎপরতাও সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভাষা বিজ্ঞানী ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র কোনো কোনো মত আপাত দৃষ্টিতে উপরোক্ত মন্ত্রণার পরিপোষকতা করে বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। ভাষার চূড়ান্ত সরলীকরণের ফলে গণশিক্ষা ত্বরান্বিত হবে এই প্রত্যাশাই তাঁর সংস্কারমূলক প্রয়াসের অনুপ্রেরণা স্বরূপ। তাঁর প্রস্তাবিত সরলায়িত বুনিয়াদী বাংলা প্রাপ্তবয়স্কদের প্রাথমিক শিক্ষাদানের সীমায়িত এলাকায় বিচক্ষণতার সঙ্গে ব্যবহৃত হলে সুফল লাভের সম্ভাবনা আছে বলে আমরাও স্বীকার করি।

২.২. দ্বিতীয় এক পক্ষ আছেন যাঁদের উপাস্য আদর্শ পূর্ববঙ্গীয় আঞ্চলিক বুলি। চলিত বাংলার শিষ্ট রূপকে তাঁরা পশ্চিমবঙ্গীয় অর্থাৎ বিজাতীয় বলে মনে করেন। শব্দ চয়নে, ক্রিয়াপদের রূপায়ণে, বাক্যাংশের নির্মাণে তাঁরা পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক উপভাষার একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করতে চান। এই তত্ত্বের প্রধান প্রচারকগণের অধিকাংশই পূর্ব পাকিস্তানের দক্ষিণপূর্বাঞ্চলের প্রতিপত্তিশালী নাগরিক। যশোর-খুলনা-কুষ্টিয়া-পাবনা-রাজশাহী-বগুড়ার উত্তর-দেশীয়

আঞ্চলিক বুলি যে চলিত বাংলার শিষ্ট রূপের নিকট-আত্মীয় এ সত্যকে তাঁরা অগ্রাহ্য করতে বদ্ধপরিকর। তাঁরা একথাও অস্বীকার করতে চান যে সমার্থক শব্দ মাত্রেই সম-ভাবনার অনুষঙ্গী নয়। প্রতি শব্দের স্বতন্ত্র অর্থ আছে, সেই অর্থের স্বতন্ত্র ভাবানুষঙ্গও তার অন্তরে নিহিত থাকে। সাহিত্যে তার দীর্ঘকালীন পৌনঃপুনিক প্রয়োগই সেই অনুষঙ্গের পরিমন্ডল গড়ে তোলে। খেয়াল-খুশী মতো তার আবেদনের ভোল পাল্টানো যায় না। 'ডর সান্ধাইয়াছে' এই বাক্যাংশ কোনক্রমেই 'আতঙ্ক সঞ্চারের' সমভাবনাত্মক বলে বিবেচিত হতে পারে না। নিরক্ষর কৃষকের শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার অর্থ এই নয় যে তাঁর মুখের বুলিকেও মার্জিত ও সাহিত্যিক গুণ-সম্পন্ন বলে সর্বত্র গ্রহণ করব। গণ-সাহিত্য সৃষ্টির অর্থ জনগণের জীবন সমস্যাকে সাহিত্যিক রূপদান করা, তার জীবনসংগ্রামকে জয়যুক্ত করার পথনির্দেশ দান করা, তার চিৎপ্রকর্ষের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষাকে জাগরিত করে তোলা। আঞ্চলিক বুলির মহিমা কীর্তনের সঙ্গে এই শিল্পগত মহৎ প্রয়াসের কোনো আত্যন্তিক যোগাযোগ নেই। যাঁরা আঞ্চলিক উপভাষাকেই প্রকৃত মাতৃভাষা বলে অভিহিত করতে চান তাঁদের মাতৃভক্তি যথার্থ স্থলে নিবেদিত হয় না। কারণ মাতৃভূমির প্রকৃত অর্থ যেমন মামার বাড়ী নয় তেমনি মাতৃভাষা বলতেও আক্ষরিক অর্থে মায়ের বুলি বা গাঁয়ের বুলিকে বোঝায় না। মাতৃভূমি স্বদেশের প্রতিশব্দ, মাতৃষাভার অর্থ স্বদেশের ভাষা।

২.৩. তৃতীয় এক পক্ষ রয়েছেন যাঁরা ভাষার ধর্মীয় প্রকৃতিতে আস্থাবান। তাঁদের মতে বাংলা ভাষার মূলগত প্রকাশরীতি বহুলাংশে হিন্দু-চিন্তাধারার বাহক ও ধারক। সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলা ভাষার দীর্ঘকালীন ঘনিষ্ঠতা তাঁদের নিকট পরম অনুশোচনার বিষয়। তাঁদের বিবেচনায় বাংলা ভাষার সঙ্গে আরবী-ফারসীর সংযোগই একমাত্র সত্য, বাদবাকী সবই কৃত্রিম উপায়ে আরোপিত, মিথ্যা এবং পরিত্যাজ্য। তাঁরা আশঙ্কা করেন যে বাংলা ভাষার কাঠামো থেকে সংস্কৃতের যাবতীয় প্রভাব চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে না পারলে এই ভাষা আমাদের তামাদ্দুনিক বৈশিষ্ট্যের বাহনে পরিণত হতে পারবে না। অনেক সময় মনে হয় যেন, বাংলা কেন ষোল আনা আরবী, ফারসী বা উর্দু হয়ে উঠল না, বাংলাই রয়ে গেল, আক্ষেপটা সেই জন্যই।

২.৪. আমার বর্তমান প্রয়োজন ও ইচ্ছানুযায়ী অতীতের ঐতিহাসিক ঘটনাক্রম, সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ও ভাষার বিবর্তন সংগঠিত হয়নি কেন সে জন্য উত্তেজনা প্রকাশ করা নিরর্থক। বাংলা ভাষাকে যে রূপে লাভ করেছি সেটাই বাংলা ভাষা। তার গঠনপ্রকৃতির মজ্জাগত বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্পর্কে নীতিমূলক বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া আমাদের দায়িত্ব বহির্ভূত। আমাদের মতে, পূর্ব পাকিস্তানী বাংলা ভাষায় হিন্দু-মুসলমান দৈনন্দিন জীবনে যে-সকল আরবী ফারসী শব্দ ব্যবহার করে অভ্যস্ত, বাংলা ভাষা থেকে সেগুলো নির্বিচারে পরিহার করবার জন্য যিনি পরামর্শ দেন তিনি হয় অজ্ঞানী নয় বিকারগ্রস্ত। তৎসম ও তদ্ভব শব্দই যে বাংলা শব্দ-ভান্ডারের বৃহত্তম অংশ, বহুস্থলে সংস্কৃত থেকে ঋণ গ্রহণ করা যে বাংলা ভাষার পদগঠন রীতি অনুযায়ী অধিক সংগত ও স্বাভাবিক — এ সকল কথা যিনি অস্বীকার করেন তিনিও তাই।

৩.০. আমাদের সৌভাগ্যবশত: পূর্ব পাকিস্তানী প্রবন্ধকার, নাট্যকার ও কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে যাঁরা আধুনিক চিন্তাধারার শিত্মকলার অনুশীলনকারী, সমকালীন পূর্ব পাকিস্তানী জীবনের যথার্থ রূপকার, বিদগ্ধ এবং মননশীল তাঁরা কেউ পূর্ব বর্ণিত অর্থে ভাষা-সংস্কারক নন। তাঁরা শিল্পী। অদ্যাবধি বাংলা ভাষায় রূপ ও রসে মূল্যবান যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে সবই তাঁদের শিল্পচেতনার অবিচ্ছেদ্য অংশ, তাদের সাহিত্যিক ঐতিহ্যবোধের বুনিয়াদ। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছ তাদের বিশিষ্ট পূর্ব পাকিস্তানী জীবনোৎকণ্ঠা, যুক্ত হয়েছে পাশ্চাত্য সাহিত্যরসের আস্বাদন শক্তি। উপভাষিক শব্দ, আরবী-ফারসী শব্দ, তৎসম শব্দ, সমাসবদ্ধ পদ, জটিল বাক্য — কোনো কিছুই তাদের কাছে আত্যন্তিকভাবে ঘৃণ্য বা পূজ্য নয়। নির্বাচিত জীবনাংশের মর্মবাণী উন্মোচনের জন্য স্বকীয় জীবনোপলব্ধির স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণের জন্য প্রত্যেক কথাশিল্পীই ভাষায় নানারকম কারিগরী প্রদর্শন করেন। এক অর্থে, সরল ও সাধু ব্যক্তিগণ যে ভাষা প্রত্যহ ব্যবহার করে সন্তুষ্ট শিল্পীর প্রাথমিক দায়িত্ব হল সেই অভ্যাসের দাসত্ব থেকে নিজেকে মুক্ত করা। এই প্রয়োজনে কেউ আঞ্চলিক বুলি সেঁচে, কেউ অভিধান ঘেঁটে, কেউ আরবী ফারসী ঢুঁড়ে সেই শব্দটি বার করেন যা অমোঘরূপে বর্ণনীয় বিষয়ের বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক, বাক্যগঠনে এমন স্বকীয় ভংগী আরোপ করেন যার নতুনত্ব অমনোযোগী পাঠককেও সচকিত করে তোলে।

৩.১. আমাদের আধুনিক লেখকগণ গ্রামজীবনের কাহিনীতে অনেক গ্রামের কথা ব্যবহার করেন। সৈয়দ ওয়ালীউলাহ নোয়াখালীর, শামসুদ্দীন আবুল কালাম বরিশালের, শাহেদ আলী সিলেটের, আবু ইসহাক বিক্রমপুরের, আলাউদ্দিন আল আজাদ চট্টগ্রামের এবং হাসান আজিজুল হক কুষ্টিয়ার আঞ্চলিক ভাষা বা ডায়ালেক্ট প্রচুর পরিমাণে তাঁদের রচনায় গ্রহণ করেছেন। তবে অধিকাংশ স্থলেই পূর্ববঙ্গীয় উপভাষা কেবল সংলাপে বাস্তবতা সম্পাদনের জন্য গৃহীত হয়। এই রীতি বাংলা ভাষায় শতবর্ষ পুরাতন। তবে এর মধ্যে যা নতুন তা হল এই যে কেউ কেউ, অজ্ঞতা বা স্বভাববশত: নয়, স্বেচ্ছায় ও সচেতনভাবে, কেবল সংলাপে নয় কাহিনী বর্ণনার কালেও স্থলবিশেষে পূর্বাঞ্চলিক শব্দ বা শব্দসমষ্টি বা বাকভংগী চমৎকার বিশিষ্টার্থে প্রয়োগ করেছেন। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র 'চাঁদের অমাবস্যা' (১৯৬৪) ও 'দুই তীর' (১৯৬৫), আলাউদ্দিন আল আজাদের 'কর্ণফুলী' (১৯৬০) ও 'ক্ষুধা ও আশা' (১৯৬৪), শাহেদ আলীর 'একই সমতলে' (১৯৬৩) এবং শহীদুল্লা কায়সারের 'সারেং বৌ' (১৯৬৩) গ্রন্থাদিতে আমাদের গদ্যরীতির এই প্রবণতার উৎকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যাবে। তবে আঞ্চলিকতা এঁদের রচনার মুখ্য আকর্ষণ নয়, গ্রাম্যতাও এঁদের স্বভাবের মুখ্য বৈশিষ্ট্য নয়। সৈয়দ

ওয়ালীউল্লাহ্‌র পত্নী ফরাসী দেশীয়, তিনি নিজেও দীর্ঘকাল যাবৎ ইয়োরোপে বসবাস করছেন। শামসুদ্দীন আবুল কালাম বর্তমানে সম্ভবত: ইতালীয় নাগরিক। শওকত ওসমান ও আলাউদ্দিন আল আজাদ উভয়ের পেশাই অধ্যাপনা এবং উভয়ের চিন্তাধারাই আধুনিক বিশ্বভাবনার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শাহেদ আলীও বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম ডিগ্রীর অধিকারী, অধ্যাপনাও করেছেন, সম্পাদক ও গবেষকও বটে। সাংবাদিক শহীদুল্লা বস্তুবাদী সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার অনুশীলন করেছেন এবং সাংবাদিক হিসেবে বহু দেশ পর্যটন করেছেন। এই সব আধুনিক শিল্পীদের মানবপ্রকৃতি সৃষ্টিধর্মী প্রতিভার সঙ্গে মননশীল নাগরিকতার সমন্বয়ে গঠিত। একথা না বুঝলে এঁদের রচনারীতির মূলসূত্রসমূহ সনাক্ত করা সম্ভব হবে না।

৩.২. পূর্ব পাকিস্তানী বাংলা গদ্যে বহুল পরিমাণে আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহৃত হয়। এই রীতিও নবোদ্ভাবিত নয়। রামরাম বসু এর প্রবর্তক, আর এর সরসতার দিকটি উন্মোচিত করেন টেকচাঁদ ঠাকুর। কিন্তু বাংলা গদ্যে আরবী-ফারসী শব্দের কৌশলময় প্রয়োগ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক রচনাকে কত প্রাণবন্ত ও মর্মভেদী করে তুলতে পারে তার পথ-প্রদর্শন করেন পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগর প্রবর্তিত এই রীতিই বাংলায় আরবী-ফারসীজাত শব্দ ব্যবহারের সর্বজন অনুসৃত রেওয়াজে পরিণত হয়। আবুল মনসুর আহমদের 'আয়না' ও মরহুম হাবীবুল্লাহ বাহারের 'হিং ও হালিম' শীর্ষক রচনাদি এই গদ্যরীতিরই চূড়ান্ত প্রকাশ। আধুনিক পূর্ব পাকিস্তানী গদ্যে আরবী-ফারসী শব্দ প্রয়োগের এক রূপদক্ষ কারিগর হলেন কথাসাহিত্যিক শওকত ওসমান। কেবল ঠাট্টা-মস্করার জন্য নয়, প্রণয়লীলা, কাব্যসাধনা, রাজকার্য পরিচালনা ইত্যাকার বিচিত্র বিষয়ের উপযোগী লঘু-গুরু ঘটনাবহ সৃষ্টির জন্যও তিনি অনর্গল আরবী-ফারসী থেকে ঋণ গ্রহণ করতে সিদ্ধহস্ত। 'ক্রীতদাসের হাসি' (১৯৬২)-ই তাঁর এই শ্রেণীর গদ্যরীতির শ্রেষ্ঠ নির্দশন।

৩.৩. অত্যাধুনিক পূর্ব পাকিস্তানী গদ্য লেখকগণ পূর্ববর্তী লেখকগণের চেয়ে অনেক বেশী বিশ্বনাগরিকতাপ্রাপ্ত এবং স্বাতন্ত্র্যাভিলাষী। এঁরা বয়সে তরুণ এবং স্বভাবে অনাস্থাবাদী। চতুষ্পার্শে দেশভক্তির নামে গ্রাম্যতা, ধার্মিকতার নামে কূপএন্ডুকতা এবং নীতিপরায়ণতার নামে অমানবিকতার প্রতাপ প্রত্যক্ষ করে এঁরা কুপিত। এঁরা সাহিত্যে সর্বপ্রকার মধ্যযুগীয়তার বিরোধী, লোক-সংস্কৃতির স্থূল সরলতার পরিপন্থী। গল্পে প্রবন্ধে এরা যে ভাষা ব্যবহার করেন তা অনভ্যস্ত ও অনাধুনিক পাঠকের কাছে সম্পূর্ণরূপে অবোধ্য। তরুণতম লেখকগোষ্ঠীর সাধনাই এই গদ্যকে আয়ত্ত করা, যার শব্দ অভিধান মন্থন করে আহৃত, পদ ব্যাকরণের কঠিন নিয়মে গঠিত, বাক্য জটিল দীর্ঘসূত্রতায় আবদ্ধ। যাঁদের সঙ্গে এঁদের আত্মার আত্মীয়তা আছে তাঁরা এই গদ্যের মর্ম অনায়াসে গ্রহণ করেন, যাঁরা আত্মীয় তাঁদের সংসর্গ এঁরা কামনা করেন না। শওকত ওসমানের সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধের ভাষায় পূর্ব পাকিস্তানী গদ্যের এই প্রখর আত্মস্বাতন্ত্র্যমন্ডিত দুরূহ কলারীতির সূত্রপাত, 'কণ্ঠস্বর' গোষ্ঠীর নবীনদের রচনায় এর ব্যাপকতম পরিণতি।

◆ ◆

## শব্দার্থ ও টীকা

**পূর্ব পাকিস্তানী গদ্য** — পূর্ব পাকিস্তানের লেখকদেরদ্বারা রচিত, সৃষ্ট ও অনুশীলিত গদ্য।

**সংস্কার-গবেষক** — যে তত্ত্বানুসন্ধানী একই সঙ্গে সংস্কারকও।

**মোহিতলাল মজুমদার** — বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্য-সমালোচক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অধ্যাপনা করেন। রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশাতেই তাঁর কাব্য আপন বৈশিষ্ট্যে প্রোজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

**এই শ্রেণীর ভাষা-বিপবীগণ** — ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে পাকিস্তান সৃষ্টির পর ভাষা সংস্কারের কথা বলে একদল অতিউৎসাহী শিক্ষিত মানুষ বাংলা ভাষার কাঠামোগত পরিবর্তন চান। মুনীর চৌধুরীর মতে, বাংলা ভাষার সাহিত্যিক মর্যাদা, বানান ও উচ্চারণের শুদ্ধ ও শিষ্ট নিয়ম যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক ও সুসংবদ্ধ। শ্রম ও সাধনার দ্বারা এ সব আয়ত্ত করতে হয়। যারা ভাষার কাঠামোগত পরিবর্তনের কথা বলছেন তারা, তাঁর মতে, ওই সব নিয়ম আয়ত্ত করেননি। এদেরকেই মুনীর চৌধুরী ব্যঙ্গ করে 'ভাষা-বিপবী' বলে অভিহিত করেছেন।

**ফরমান জারী** — (প্রধানত বাদশাহী) হুকুম বা হুকুমনামা।

**ণত্বষত্ব-বিধি** — বাংলা ব্যাকরণে 'ণ' ও 'ষ' ব্যবহারের সুনির্দিষ্ট নিয়মাবলী।

**'কণ্ঠস্বর'** — পূর্ব পাকিস্তানের একটি সাহিত্যপত্রিকার নাম।

## বস্তুসংক্ষেপ

তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা গদ্যের রূপায়ণ ও অনুশীলনের বর্ণনাকে দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথমত পূর্ব পাকিস্তানী গদ্যের আদর্শ সম্পর্কে সুপারিশ, ভবিষ্যদ্বাণী ও তত্ত্বালোচনা; দ্বিতীয়ত সৃষ্টির ক্ষেত্রে সাহিত্যিকদের বিভিন্নমুখী

প্রয়াসের প্রত্যক্ষ ফসল। পূর্ব পাকিস্তানে উৎসাহী যে সংস্কারকগণ বাংলা গদ্য সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন তারা অনেকেই ভাষার আদর্শ সম্পর্কে অজ্ঞ ও বিশুদ্ধ বাক্য রচনায় অক্ষম। তারা যে প্রস্তাব করেন তা বাংলা ভাষার মূলগত বুনিয়াদ থেকে উদ্ভূত নয়। নিজের মনগড়া ধর্মীয় সংস্কৃতির নামে বর্ণমালার পরিবর্তন ও পদগঠনে অভিনব নিয়ম প্রবর্তনের আগ্রহী এখানে প্রকাশিত। আরবী-ফারসী শব্দের বলপ্রয়োগপূর্বক ব্যবহারের পক্ষপাতী তারা। ভাষা-বিজ্ঞানী ডক্টর শহীদুলাহ্‌র ভাষা-বিষয়ক কোন কোন বক্তব্য আপাতদৃষ্টিতে এই সংস্কারবাদীদের মতের পৃষ্ঠপোষকতা করে বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা নয়। শহীদুল্লাহ্‌র প্রস্তাবে গণশিক্ষা ত্বরান্বিত ও প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপকতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে।

এক পক্ষ আছেন, যারা চলতি বাংলার শিষ্ট রূপকে বিজাতীয় মনে করেন। তারা চান ভাষায় শব্দ চয়নে, ক্রিয়াপদের রূপায়ণে, বাক্যাংশের নির্মাণে পূর্ব-পাকিস্তানের আঞ্চলিক উপভাষার একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হোক। এদের অধিকাংশই পূর্ব পাকিস্তানের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের প্রতিপত্তিশালী নাগরিক। অথচ তারা জানেন না যে, নিরক্ষর কৃষকের শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার অর্থ তার মুখের বুলিকে মার্জিত ও সাহিত্যিক গুণসম্পন্ন বলে গ্রহণ করা যায় না। গণসাহিত্য পৃথক জিনিস — এখানে থাকবে জনজীবনের সমস্যার সাহিত্যিক রূপায়ণ এবং জীবনসংগ্রামে জয়ী হতে জনসাধারণের প্রতি দিক নির্দেশনা। এই কাজ উপভাষা নয়, মাতৃভাষাতেই যথাযথভাবে সমাধান করা সম্ভব। আর এক পক্ষে কতিপয় ব্যক্তি আছেন, যারা কোনভাবেই মেনে নিতে চান না সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলার নিবিড় ঘনিষ্ঠতা। তারা মনে করেন এ সম্পর্ক বুঝি বাংলা ভাষায় হিন্দু চিন্তাভাবনার অনুপ্রবেশ। বাংলা ভাষার সব শব্দই কেন আরবী বা ফারসী হয়ে উঠলো না এ বিষয়ে তাদের আক্ষেপ যথেষ্ট।

ভাষার অতীত ইতিহাসকে অস্বীকার করা হীনবুদ্ধির পরিচায়ক। বাঙালির প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহারের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষার বিকাশ। এতে একীভূত আরবী-ফারসী শব্দ নির্বিচারে পরিহার করার পরামর্শ প্রদানও যেমন সঠিক নয়, তেমনি বাংলা শব্দ-ভান্ডারের বৃহত্তম অংশ সংস্কৃত ও সংস্কৃতজাত শব্দও পরিত্যাগ করা যাবে না। যারা এ সব বর্জনের পক্ষপাতী তারা হয় অজ্ঞানী, নয় বিকারগ্রস্ত। এ অবস্থার মধ্যে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে আধুনিক চিন্তাধারার ধারক ও বাহক এবং সমকালীন জীবনের যথার্থ রূপকার হিসেবে কয়েকজন বলিষ্ঠ প্রবন্ধকার, নাট্যকার ও কথাসাহিত্যিক আবির্ভূত হয়েছেন। তাদের কাছে শিল্পচেতনা, সাহিত্যিক ঐতিহ্যবোধ বড় বলে নিজেদের সৃষ্টিতে তুলে আনছেন স্বদেশী জীবনোৎকণ্ঠা, কিন্তু সংমিশ্রণ ঘটাচ্ছেন পাশ্চাত্য সাহিত্যরস। সংস্কৃত বা আরবী-ফারসী অথবা উপভাষিক শব্দ তাদের কাছে প্রধান বিবেচ্য নয়। মানব জীবনের মর্মবাণী উন্মোচনে, নিজের জীবনোপলব্ধির স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণে তারা যে কোন শব্দবিন্যাসে সাহিত্যিক কুশলতা প্রকাশ করতে বদ্ধ পরিকর। এ কারণে তারা শ্রমনিষ্ঠ হন এবং তাদের আহৃত শব্দ বা সাহিত্যিক কুশল বিন্যাসে অমনোযোগী পাঠকও সচকিত হন। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌, শামসুদ্দীন আবুল কালাম, আবু ইসহাক, হাসান আজিজুল হক প্রমুখ আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করে তাঁদের রচনায় গ্রামজীবনের কাহিনী ফুটিয়ে তুলেছেন। এতে তাঁরা পাত্রপাত্রীর সংলাপে বাংলা ভাষার পুরাতন রীতি অনুসারে পূর্ববঙ্গীয় উপভাষা ব্যবহার করেন। অনেকে অবশ্য স্বেচ্ছায় ও সচেতনভাবেই সংলাপের পাশাপাশি কাহিনী বর্ণনাতেও স্থলবিশেষে পূর্বাঞ্চলিক শব্দ বা বাকভঙ্গি ব্যবহারের পারঙ্গমতা দেখিয়েছেন। অজ্ঞতা নয়, সৃষ্টিধর্মী প্রতিভার সঙ্গে মননশীল বিশ্বনাগরিকতার সমন্বয়ে গঠিত তাঁদের এই আধুনিক শিল্পী-মন। পূর্ব পাকিস্তানী গদ্যে বহুল পরিমাণে আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহারের রীতির আবিষ্কারক রামরাম বসু এবং এর সরসতার দিক উন্মোচনকারী টেকচাঁদ ঠাকুর। পরে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিদ্রূপাত্মক রচনায় এবং পূর্বপাকিস্তানে আবুল মনসুর আহমদ, হাবীবুল্লাহ বাহার, শওকত ওসমান প্রমুখের রচনায় এই রীতির ব্যবহার দেখা যায়।

তদানীন্তন পূর্বপাকিস্তানে তরুণ লেখকগণ গদ্যরচনার ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী লেখকদের চেয়ে যথেষ্ট স্বাতন্ত্র্যাভিলাষী ছিলেন। বিশ্বনাগরিকতাপ্রাপ্ত এ সব লেখকগণ স্বভাবে অনাস্থাবাদী। দেশভক্তি, ধর্মভীতি ও নীতিপরায়ণতার নামে অমানবিকতার এরা বিরোধী। মধ্যযুগীয় পশ্চাৎপদতা আর লোকসংস্কৃতির নামে স্থূল সরলতা বর্জনীয় এদের কাছে। অনভ্যস্ত ও অনাধুনিক পাঠকেরা এদের ভাষা বুঝতে পারেন না। অভিধান মন্থন করে শব্দ আহরণ, ব্যাকরণের কঠিন নিয়মে পদ সংগঠন, জটিল দীর্ঘসূত্রতায় বাক্য গঠন করে এরা আত্মস্বাতন্ত্র্যমন্ডিত দুরূহ এক কলারীতির সূত্রপাত করেছেন। 'কণ্ঠস্বর' সাহিত্যপত্রিকাকে ঘিরে যে গোষ্ঠী গড়ে ওঠেছে তাঁরা এই ধারাকে ব্যাপকতম পরিণতির দিকে নিয়ে চলেছেন।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন

**সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্নের উত্তর লিখুন**

১. ভাষার মাধ্যমে যারা স্বকপোলকল্পিত তামাদ্দুনিক স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চান বাংলা ভাষা সম্পর্কে তাদের প্রকৃত ধারণা কি ?
২. আঞ্চলিক বুলির মহিমা কীর্তনের সঙ্গে সাহিত্য-শিল্পগত মহৎ প্রয়াসের আত্যন্তিক যোগাযোগ নেই — কেন?
৩. বাংলা ভাষা থেকে যারা সংস্কৃত শব্দসমূহ বা বহুল ব্যবহৃত আরবি -ফারসি শব্দাবলী বর্জন করার কথা বলে তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি ?
৪. পূর্ব পাকিস্তানে যারা শিল্পী-মানসিকতা নিয়ে সাহিত্যচর্চা করেছেন তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য কি ?
৫. আত্মস্বাতন্ত্র্যমন্ডিত দুরূহ কলারীতির মাধ্যমে যে গদ্য চর্চা শুরু হয় এর অগ্রদূত কারা ?

**২ নং সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নের নমুনা-উত্তরঃ**

তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা ভাষা সংস্কারের কথা যারা বলছিলেন তাদের একটি গোষ্ঠী চলতি বাংলার শিষ্ট রূপকে পশ্চিমবঙ্গীয়, তাই বিজাতীয় আখ্যা দিয়ে পরিত্যাজ্য মনে করেন। তারা পূর্বপাকিস্তানী বাংলা গদ্যে পূর্বাঞ্চলিক মৌখিক বুলির যথেচ্ছ প্রয়োগের পক্ষে। কিন্তু তারা হয়তো জানেন না যে, নিরক্ষর মানুষের আঞ্চলিক বুলির যথেচ্ছ ব্যবহারই যেমন শুধু গণসাহিত্য নয়, তেমনি এতে সাহিত্যিক গুণও ক্ষুণ্ন হতে বাধ্য। সাহিত্যিক গুণ ক্ষুণ্ন হলে মহৎসৃষ্টি হয় না। আঞ্চলিক বুলির মহিমা কীর্তনে আবেগ থাকতে পারে। কিন্তু শিল্প সৃষ্টির জন্যে দরকার সাহিত্যিক মানসম্পন্নতা।

**প্রসঙ্গ উলেখ করে ব্যাখ্যা লিখুন**

১. বিদ্যাসাগর প্রবর্তিত গদ্যই পরবর্তীকালের বাংলা ভাষার বহুমুখী বিকাশের রীতিগত ভিত্তিভূমি।
২. পৃথিবীর অন্যান্য ভাষার মত বাংলা ভাষার ক্রমবিকাশ পরীক্ষা করলেও যে সত্যটি উপলব্ধি করা যায় তা হল এই যে, ভাষা পরিবর্তনশীল এবং বৈচিত্র্যের অনুসন্ধানী।
৪. দেড়শত বছরের বাংলা গদ্যের বিচিত্র ঐশ্বর্যে এই ঐতিহ্যকে সম্পূর্ণরূপে শোষণ করে নিয়েই প্রতিভাবান পূর্ব পাকিস্তানী সাহিত্যকর্মী আজ বাংলা ভাষার প্রকাশ-ক্ষমতার নব নব দিগন্ত উন্মোচনে ব্যাপৃত।
৪. অনেক সময় মনে হয় যেন, বাংলা কেন ষোল আনা আররি, ফারসি বা উর্দু হয়ে উঠল না, বাংলাই রয়ে গেল, আক্ষেপটা সেই জন্যই।

**৪ নং ব্যাখ্যার নমুনা-উত্তরঃ**

ব্যাখ্যেয় অংশটুকু প্রখ্যাত নাট্যকার ও প্রবন্ধকার মুনীর চৌধুরী রচিত 'বাংলা গদ্যরীতি' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলা ভাষা সংস্কারের প্রশ্নে যারা ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বাংলাকে অন্যভাষায় পরিণত করার পক্ষে ছিলেন তাদের কটাক্ষ করা হয়েছে এই পঙক্তির মাধ্যমে।

বাংলা ভাষার সরলীকরণের নামে পূর্বপাকিস্তানে ভাষা-সংস্কারের যে উদ্যোগ গৃহীত হয় তাতে একদল পন্ডিত মত দেন যে, চলিত বাংলার শিষ্টরূপ পশ্চিমবঙ্গীয় তথা বিজাতীয়। তাই পূর্বাঞ্চলের কথ্যভাষার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা দরকার। অন্য একদল পন্ডিত অভিমত প্রদান করেন যে, বাংলা ভাষায় সংস্কৃত শব্দের আধিক্য, পদবিন্যাস রীতি ও বাক্যগঠন প্রক্রিয়া হিন্দু চিন্তাধারার বাহক ও ধারক। তাই বাংলা ভাষা থেকে এসব বর্জন করে নির্বিচারে আরবি-ফারসি শব্দের আমদানি জরুরি। এভাবেই পূর্ব পাকিস্তানে ইসলামি তামাদ্দুনিক সৃষ্টির পথ সহজ হবে। তাদের এই অভিমত বাংলা ভাষার উদ্ভব ও বিকাশের বিরোধী। তারা সম্ভবত বাংলা ভাষার সাংগঠনিক দিকটি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। মুনীর চৌধুরী তাদের কটাক্ষ করেই ব্যাখ্যেয় বাক্যটি লিখেছেন।

**রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর লিখুন**

১. 'বাংলা গদ্যরীতি' প্রবন্ধের বস্তুসংক্ষেপ লিখুন।
২. বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশের ধারা 'বাংলা গদ্যরীতি' প্রবন্ধের আলোকে বিবৃত করুন।
৩. তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের প্রবন্ধকার, নাট্যকার ও কথাসাহিত্যিকগণকে প্রকৃত অর্থে শিল্পী বলা হয়েছে কেন? বিস্তারিত লিখুন।
৪. 'আধুনিক শিল্পীদের মানবপ্রকৃতি সৃষ্টিধর্মী প্রতিভার সঙ্গে মননশীল নাগরিকতার সমন্বয়ে গঠিত।' — 'বাংলা গদ্যরীতি' প্রবন্ধের আলোকে বিস্তারিত লিখুন।
৫. বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশের ধারা আলোচনা করে মুনীর চৌধুরী তাঁর কালের সাম্প্রতিক বাংলা গদ্যের রীতিগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যে আলোকপাত করেছেন তার পরিচয় দিন।

**২ নং রচনামূলক প্রশ্নের নমুনা-উত্তর**

উনিশ শতকে বাংলা গদ্যের উদ্ভব হলেও এর প্রথম চারটি দশকে যে ধরনের গদ্য রচিত ও চর্চিত হয়েছে তাতে কোন সুনির্দিষ্ট আদর্শ গড়ে ওঠেনি। অষ্টাদশ শতাব্দীর দলিল বা চিঠিপত্রে গদ্যের নমুনাতে এই গদ্যরূপ ছিলো আরো অনির্দিষ্ট ও খন্ডিত। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের হাতে বাংলা গদ্য প্রথম ঐশ্বর্যে পরিমন্ডিত হয়; 'বেতালপঞ্চবিংশতি' (১৮৪৭) এর উদাহরণ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ কারণেই বিদ্যাসাগরকে বাংলা গদ্যের 'প্রথম শিল্পী' বলে আখ্যায়িত করেন।

প্রকৃতপক্ষে, বাংলা গদ্যের উন্মেষ পর্বে তিন ধরনের, রীতি- বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। উইলিয়াম কেরী ইতরজনের মৌখিক বুলির অমার্জিত প্রয়োগ করেন তার রচিত 'কথোপকথন' গ্রন্থে। রামরাম বসু তার 'প্রতাপাদিত্য চরিত্র' গ্রন্থে আরবি-ফারসি শব্দের বিষয়োপযোগী ব্যবহার করেন। আর মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার তার 'বত্রিশ সিংহাসন' গ্রন্থে সংস্কৃত পদ ও বাক্য গঠনরীতি অনুসরণ করেন। পরবর্তীকালে বাংলা গদচর্চায় এই তিনটি ধারাই নানাভাবে অনুসৃত হতে দেখা যায়। প্যারীচাঁদ মিত্র, দীনবন্ধু মিত্র প্রমুখ উইলিয়াম কেরী অনৃসৃত ভাষারীতি যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধন করেন। মুসলমান লেখকগণ রামরাম বসুর পথ ধরে এগিয়ে যান। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর গ্রহণ করেন মৃত্যুঞ্জয়ের পথ, তবে একটু মার্জিত ও শিল্পসম্মত করে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা গদ্যে বিষয়োপযোগী রীতি প্রবর্তনে যথার্থ অর্থেই সার্থকতা দেখান। তিনি প্যারীচাঁদ ও বিদ্যাসাগর উভয়ের গদ্যরীতিকে সমন্বিত করে তাতে ঘটান নন্দনতত্ত্বের মিশ্রণ। ফলে বঙ্কিমচন্দ্রের অনুসৃত গদ্যরীতি পৃথক সত্তা নিয়ে অধিক হৃদয়গ্রাহী হয়ে ওঠে। পরবর্তীকালে এই ভাষাকেই নিজের অনন্যসাধারণ ভাবকল্পনার উপযোগী বাহনরূপে পুনর্গঠিত করেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি ভাষাকে করে তোলেন সূক্ষ্ম ও প্রগাঢ়, সংকেতময় ও কারুকার্যমন্ডিত। প্রমথ চৌধুরী সুপ্রতিষ্ঠিত রাবীন্দ্রিক গদ্যরীতি অতিক্রম করে বিদগ্ধজনের কথ্য বুলির আদলে সৃষ্টি করেন নতুন এক প্রখর ও শাণিত গদ্যধারা। প্রমথ চৌধুরীর গদ্যরীতি এতোই প্রভাব বিস্তারী হয়ে উঠেছিলো যে, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এরদ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। 'গল্পগুচ্ছ'-এ রবীন্দ্র গদ্যে যে পরিবর্তন দেখা যায় তা এই প্রভাবের ফল। বাংলা গদ্য এরপর নানাভাবে বিভিন্ন লেখক-শিল্পীর কুশল-পরিচর্যায় পরিবর্তিত হয়েছে। শরৎচন্দ্র, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, মুজতবা আলী কিংবা অন্নদাশঙ্কর রায়ের গদ্যে নিজ নিজ ব্যক্তিমানসের প্রবণতা ও বিশিষ্টতার ছাপ তাই লক্ষ্যযোগ্য।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর পূর্ব পাকিস্তানি গদ্যের আদর্শ নিরূপণের চেষ্টা চলে। পন্ডিত সংস্কারক-গবেষকদের একটি দল বাংলা ভাষার সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার ঘনিষ্ঠতাকে হিন্দুসংস্কৃতির সঙ্গে সংযোগ বলে মনে করেন। বাংলা ভাষা শুধু আরবি-ফারসি শব্দ নিয়ে গঠিত কেন নয় — এই তাদের আক্ষেপ। তারা ফরমান জারি করে প্রচলিত বর্ণমালা, বানানা-বিধি ও পদসংগঠন রীতি পরিবর্তনের পক্ষে। তাদেরই একদল, চলিত বাংলার শিষ্ট রূপের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গীয় বিজাতীয় সংস্কৃতি আবিষ্কার করে বাংলা ভাষায় পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক ভাষার একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করতে চান। ভাষা-সংস্কারকদের এ ধরনের বিতর্কের মধ্যেই পূর্ব পাকিস্তানের প্রবন্ধকার, নাট্যকার কথাসাহিত্যিকগণ শিল্পী-মানকিতা নিয়ে একটি সাহিত্যিক গদ্যধারা সৃষ্টি করেন। মুনীর চৌধুরী লিখেছেন, 'নির্বাচিত জীবনাংশের মর্মবাণী উন্মোচনের জন্য, স্বকীয় জীবনোপলব্ধির স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণের জন্য প্রত্যেক কথাশিল্পীই ভাষায় নানারকম কারিগরী প্রদর্শন করেন।' তাঁদের কাছে জীবনের মর্মবাণীই আসল, ভাষা-প্রশ্নে অযথা বিতর্ক অর্থহীন। মননশীল বিশ্বনাগরিক হয়েও তাঁরা গদ্যে পাত্র-পাত্রীর সংলাপে আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগ করেছেন। এই রীতি নতুন নয়। তবে, সচেতনভাবে ও শৈল্পিক পরাকাষ্ঠায় তাঁরা কেবল সংলাপে নয়, কাহিনী বর্ণনাকালেও স্থানবিশেষে পূর্বাঞ্চলিক শব্দ বা বাকভঙ্গি প্রয়োগ করে বাংলা গদ্যধারায় নতুন পথের সৃষ্টি করেছেন। কেউ কেউ আরবি-ফারসি শব্দের কৌশলময় প্রয়োগের মাধ্যমে ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপাত্মক রচনাকে অধিক হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছেন। লেখক মুনীর চৌধুরীর সমকালে যারা গদ্য রচনা করছিলেন তাঁদের তিনি 'অত্যাধুনিক পূর্ব পাকিস্তানী গদ্য লেখকগণ' বলে অভিহিত করেছেন। তারা গ্রাম্যতা, ধর্মীয় কূপএন্ডুকতা ও নীতিবোধহীনতা অপছন্দ করেন। তরুণতম এই লেখকগোষ্ঠী অভিধান মন্থন করে শব্দ আহরণ করেন, পদ ব্যাকরণের কঠিন নিয়মে বেঁধে দেন, বাক্যকে দীর্ঘসূত্রতায় আবদ্ধ করেন। তাদের সম্বন্ধে যোগসূত্রহীন অনভ্যস্ত ও অনাধুনিক পাঠক তাঁদের দুরূহ কলারীতির রস গ্রহণ থেকে বঞ্চিত হন। মুনীর চৌধুরীর স্বকালে এই ছিলো বাংলা গদ্যের রীতিগত বৈশিষ্ট্য।